ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

সেপ্টেম্বর ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

সবার জন্য আবাস

সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং সবার জন্য আবাস
অম্লানজ্যোতি গোস্বামী, গৌতম ভান

সুলভ আবাসনের জন্য অর্থসংস্থান
চরণ সিং

বিশেষ নিবন্ধ

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে দুর্নীতি রুখতে নতুন আইন
রঞ্জিৎ মেহতা

সংকল্প থেকে সিদ্ধি

গান্ধীর সেই চরম ঘোষণা
এ. আন্নামালাই

ফোকাস

স্বাধীনতার সত্তর বছর
বাল্মীকি প্রসাদ সিং

স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

সারসংক্ষেপ

দেশের একাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের সকালে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণের নির্বাচিত কিছু সারাংশ এখানে তুলে ধরা হল।

- এ এক অতি বিশেষ বছর। এক দিকে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ৭৫-তম বার্ষিকী। অন্য দিকে মহাত্মা গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের শততম বর্ষ। পাশাপাশি আবার (বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত) "গণেশ উৎসব"-এর একশো পঁচিশতম বর্ষ।
- "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের বক্তব্য ছিল ইংরেজ ভারত ছাড়ো, আর আজকের দিনের আহ্বান হচ্ছে, "ভারত জোড়ো"।
- এক "নতুন ভারত" গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে দেশকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল, এই সময় পর্বে দেশ এক অভূতপূর্ব সংঘবদ্ধ শক্তির নজির দেখিয়েছিল। আর আগামী পাঁচ বছর আমাদের সবাইকে সেই একই রকম সংঘবদ্ধ শক্তি, দায়বদ্ধতা এবং কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ না করে, দেশের ১২৫ কোটি মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির সদ্ব্যবহার করে আমাদের এক "নতুন ভারত" গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে যেতে হবে।
- এই "চলছে চলবে" মনোভাবের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে আমদের। আমাদের মাথার মধ্যে "বদল সম্ভব", এই শব্দবন্ধ গেঁথে নিতে হবে। আর সেই পরিবর্তিত মনোভাবই আমাদের আগামী দিনের পাথেও হবে।
- "টিম ইন্ডিয়া"-র তরফে এক "নতুন ভারত" গড়ার দায়বদ্ধতার শপথ নেওয়ার এটাই সঠিক সময়।
- দেশের সুরক্ষা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে।
- সদ্য লাগু হওয়া "পণ্য ও পরিষেবা কর", "Cooperative Federalism" কতটা সামর্থ্য রাখে, তা আমাদের দেখিয়েছে। জি এস টি-র সমর্থনে গোটা জাতি একজোট হয়ে এগিয়ে এসেছিল। প্রযুক্তির ভূমিকাও এখানে বিশেষ কাজে এসেছিল। দেখা যাচ্ছে, জি এস টি পরবর্তী সময়ে পরিবহণ ক্ষেত্রে সাশ্রয় এবং কর্মদক্ষতা বেড়েছে। কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি ঘটেছে ৩০ শতাংশ।
- ভারতের মন্ত্র শান্তি, একতা ও সদ্ভাব। জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা সর্বাংশে বর্জনীয়, তা আমাদের কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।
- কালো টাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে ..... দুর্নীতিমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল মিলতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। সবাই মিলে আমরা এমন এক ভারত গড়ে তুলব, যেখানে স্বজনপোষণ ও ভ্রষ্টাচারের কোনও স্থান নেই। ইতোমধ্যেই ১.২৫ লক্ষ কোটি কালো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে.; ১.৭৫ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
- এখন এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়। "ডিজিট্যাল অর্থনীতি"-র প্রসার ও "ভীম অ্যাপ"-কে গ্রহণ করতে হবে।
- "Cooperative Federalism" থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে "Competitive Cooperative Federalism"-এ। বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ বয়স্ক জনসংখ্যার আধিক্য ভারতে। যুগটা হল তথ্য-প্রযুক্তির ; আসুন আমরা সবাই ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে লেনদেনে সড়োগড়ো হয়ে উঠি।

- আমরা এমন এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলব যেখানে কিষাণরা কোনও রকম দুঃস্বপ্নের তাড়না ছাড়াই রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। আজকে তাদের যা উপার্জন আগামীতে তার থেকে অন্তত দ্বিগুণ হবে তাদের উপার্জন।
- আমাদের সংকল্প এমন এক ভারত গঠন, যেখানে তরুণ প্রজন্ম ও মহিলারা তাদের নিজস্ব স্বপ্ন পূরণের সব রকম সুযোগসুবিধা পাবেন।
- আমাদের সংকল্প এমন এক ভারত গঠন, যা কিনা সন্ত্রাসবাদ মুক্ত, সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এবং বর্ণভেদ মুক্ত।
- আমাদের সংকল্প এক "দিব্য" ও "ভব্য" ভারত গঠন।❑

সেপ্টেম্বর, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ — দুর্গাশঙ্কর মিশ্র — ৫
- জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং সবার জন্য আবাস — অম্লানজ্যোতি গোস্বামী, গৌতম ভান — ১২
- সুলভ আবাসনের জন্য অর্থসংস্থান — চরণ সিং — ১৫
- লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকাতেও সবার মাথায় এক চিলতে ছাদ — সমীরা সৌরভ, রাহুল সিং — ১৮
- স্মার্ট সিটিতে গরিবের মাথা গোঁজার ঠাঁই — উষা পি. রঘুপতি — ২৩
- আবাসন ও পরিকাঠামো : প্রশাসনের অগ্রাধিকার — কৃষ্ণ দেব — ২৯
- সুলভ আবাস নির্মাণে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার — যশকুমার শুক্ল — ৩৫

বিশেষ নিবন্ধ

- স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে দুর্নীতি রুখতে নতুন আইন — রঞ্জিৎ মেহতা — ৩৮

সংকল্প থেকে সিদ্ধি

- গান্ধীর সেই চরম ঘোষণা — এ. আন্নামালাই — ৪১

ফোকাস

- স্বাধীনতার সত্তর বছর — বাল্মীকি প্রসাদ সিং — ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৫০
- উন্নয়নের রূপরেখা — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৫১
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৫২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৫৪
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৫৫
- আমাদের প্রকাশন — যোজনা ব্যুরো — ৭০

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

মাথার উপর একটি ছাদ

মাথার উপর একটি ছাদ, এই স্বপ্ন আকুল হয়ে দেখে থাকেন মানুষ মাত্রেই। বিত্তশালী ও বিখ্যাত লোকজন যেখানে গড়ে তোলেন প্রাসাদোপম অট্টালিকা, হতদরিদ্র মানুষটি সেখানে নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য কেবল একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে জানপ্রাণ কবুল করে দেন। হতে পারে তা ছেঁড়া প্লাস্টিকের ঝুপড়ি মাত্র।

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সমাজের চোখে "নিজস্ব বাড়ি" বিষয়টি এমন কিছু বড়ো ব্যাপার ছিল না। যৌথ পরিবারের চলন বেশি থাকায় সেসময় গোটা পরিবারের সদস্যদের বসবাস একটিই বাড়িতে, অর্থাৎ, পারিবারিক/পৈত্রিক বাড়িতে। কাজের বা উপার্জনের খোঁজে শহরে পাড়ি জমানোর প্রবণতা বাড়তে থাকায়, প্রতিটি পরিবারের জন্য আলাদা বাসস্থানের বিষয়টি বেশ বড়োসড়ো ইস্যু হয়ে ওঠে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে "নিউক্লিয়ার পরিবার" বাড়তে থাকে; পরিস্থিতির চাপেই পৈত্রিক বাড়ি, বাবা-মাকে ছেড়ে সন্তানরা আলাদা থাকতে বাধ্য হয়। শহরাঞ্চলে যত বেশি মানুষের ভিড়ভাট্টা বাড়ে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বস্তি ও জমি জবরদখল করে তৈরি কলোনিতে মানুষের বাস। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে শহরবাসী মানুষের সংখ্যা তার আগের দশ বছরের সময়সীমার মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১ মিলিয়ন। সংশ্লিষ্ট জনগণনার তথ্য-পরিসংখ্যান আরও দেখাচ্ছে, ২০১২ সালের শুরুতে দেশে বাসস্থানের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮.৭৮ মিলিয়ন। মূলত অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণি এবং নিম্ন আয়ের মানুষজনের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব প্রকট।

বর্তমান সময়ের এক অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ সকলের জন্য সাধ্যের মধ্যে আবাসের বন্দোবস্ত। আগেকার দিনে মানুষ অবসরের আগে-পরে, নিদেন মাঝবয়সে এসে নিজস্ব বাড়িঘর তৈরির কথা ভাবত। কিন্তু এখনকার দিনে তরুণ প্রজন্মের কাছে নিজের নিজের 'আশিয়ানা'-র জন্য প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের কেরিয়ার শুরু করার সময় থেকেই, নিজস্ব একটি স্থায়ী আস্তানার খোঁজ করতে একরকম বলা যায় বাধ্য হচ্ছে তারা। শহরাঞ্চলে জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাটের আকাশছোঁয়া দামের দৌলতে সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেওয়াটা ক্রমশ সাধ্যের অতীত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চড়চড় করে বাড়তে থাকা বাড়িভাড়া, অসাধু বিল্ডার, অনুমোদনহীন জমির ব্যবহার, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি কার্যকারণের দৌলতে আবাসের চাহিদা ও জোগানের মধ্যেকার ফাঁকটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে।

এ এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিল বিভিন্ন প্রয়োজনে জমির যথাযথ এবং ন্যায্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারে। ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত (Real Estate) (নিয়ামন ও উন্নয়ন) আইন লাগু করেছে সরকার; উদ্দেশ্য ঘরবাড়ি ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র উদ্দেশ্য দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দারিদ্র্য সীমারেখার নিচের শ্রেণির নাগরিকদের আবাস সমস্যার সমাধান করতে শহরাঞ্চলে সকলের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়া। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)'-এর উদ্দেশ্য কাঁচা এবং ভেঙ্গেচুরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাড়িতে বাস করছে এমন সমস্ত পরিবারের জন্য প্রাথমিক সব সুযোগসুবিধা-সহ পাকা বাড়ির বন্দোবস্ত করা। এর সঙ্গে জড়িত আর্থিক দিকগুলির মধ্যে 'জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক' (National Housing Bank) আবাসন শিল্পক্ষেত্রে অর্থলগ্নীকারী কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও অংশত নিয়ন্ত্রণ করে। গৃহঋণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ভরতুকি প্রকল্পগুলি এমনকী যারা আবাস ব্যয়ভার বহন করতে অপারগ, তাদের জন্যও বাড়ি তৈরির টাকা-পয়সার জোগাড়যন্ত্রে সাহায্য করে।

আবাসন ক্ষেত্রের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিকাঠামো। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর সুযোগসুবিধা, যেমন কিনা রাস্তাঘাট, মেট্রো রেল, স্কুল, হাসাপাতাল, বাজারহাট ও দোকানপাট, বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য পার্ক ইত্যাদি গড়ে তোলাটা আগামী ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসের বন্দোবস্ত করার প্রতিশ্রুত সফলভাবে পূরণের অপরিহার্য শর্ত। আজকের দিনের পরিস্থিতিতে টেকসই তথা পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের উপর একই রকম জোর দিতে হবে। বাড়িঘরের নকশা এমনটা হওয়া উচিত যাতে করে কালের এবং প্রকৃতির দাপট ও ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'সবুজ প্রযুক্তি'-র উল্লেখ করতে হবে। তা এক দিকে যেমন পরিবেশবান্ধব, অন্য দিকে গরম কালে কৃত্রিম উপায়ে ঘর ঠাণ্ডা করার ও শীতের দিনে হিটার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাও কমিয়ে দেয়। এখানে আলাদা করে আর যে দু'টি কর্মসূচির উল্লেখ করতে হয়, তা হল 'স্মার্ট সিটি মিশন' ও 'অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন' (AMRUT) সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলির মোকাবিলা করে শহরগুলি নতুন করে গড়ে তুলতে জোর দেওয়া হয়েছে এই দুই প্রকল্পে। যাতে করে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সংস্থান করে আম নাগরিকদের জন্য এক পরিচ্ছন্ন ও সুস্থায়ী পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার গুণগত মান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া যায়।

পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন হল একটা ঠিকঠাক মতো মাথা গোঁজার ঠাঁই। আর সরকার ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশের শেষতম নাগরিকটির জন্যও আরও একটু স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে, আরও একটু ভালো ঘরবাড়ির সংস্থান করে দিতে।❑

শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

সংবিধানে 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন' রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, তাই মিশনকে সার্থক করে তুলতে রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যগুলিকে অবশ্যই এমন একটি সুসংবদ্ধ আবাসন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে অগ্রাধিকার পাবে সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো। নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি রাখতে হবে আবাসন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনার দিকটির ওপরও। শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের দাবি মেটাতে স্বল্পব্যয়বিশিষ্ট প্রকৌশল ও দ্রুত সম্পন্নযোগ্য নির্মাণ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে ব্যাপক মাত্রায়। আর এভাবেই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন এজেন্সি-সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মিলিত অঙ্গীকারই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভিসন-কে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে এবং ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আগেই পূরণ হবে সকলের জন্য আবাসনের স্বপ্নপূরণ।

শহরাঞ্চলই অর্থনৈতিক বিকাশ ও উদ্ভাবনের মূল চালিকা শক্তি। জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই হলেন নগরবাসী যাদের মাধ্যমে উৎপন্ন হচ্ছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র তিন-পঞ্চমাংশ।[১]

দেশের অর্থনীতিতে আবাসন ক্ষেত্রটির গুরুত্ব খুব বেশি, কারণ এই ক্ষেত্রের সঙ্গে আরও প্রায় ২৬৯-টি শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আবাসন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে অর্থনীতিতে তার প্রত্যক্ষ অনুকূল প্রভাব পড়বে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জিডিপি বৃদ্ধি ও ক্রয়-ব্যবহার বিন্যাসের ওপর।[২]

বিশ্বের সর্বত্র এটা এখন স্বীকৃত সত্য যে সুস্থায়ী নগর ও আবাসন উন্নয়নের দ্বারা মানুষের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা সম্ভব। সেই মতো ২০১৬-এর জনবসতি বা Habitat-III-র নতুন নগরাঞ্চল অ্যাজেন্ডার মূল কেন্দ্রে আবাসনকে রাখা হয়েছে।[৩] সেন্ডাই কাঠামো (২০১৫)[৪] এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তিতে (২০১৬)[৫] যে সব অঙ্গীকার রয়েছে তা পূরণ করতে সুস্থায়ী ও বিপর্যয়-প্রতিরোধী আবাসনকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য ঘোষিত অভীষ্টগুলির ১১ নং অভীষ্টে[৬] শহর ও জনপদগুলিকে সকলের জন্য নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও সুস্থায়ী করার উল্লেখ্য রয়েছে। ভারতও ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসন মিশনের সূচনা করেছে যাতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে আবাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য নিবন্ধকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিভাগে দেশের আবাসন চিত্র ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধের তৃতীয় বিভাগে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বিভিন্ন নীতি ও সরকারি পদক্ষেপগুলিকে। চতুর্থ বিভাগে প্রাধান্য পেয়েছে আবাসনের সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়ন মিশনের সমকেন্দ্রিকতার দিকগুলি। নিবন্ধের শেষাংশে রয়েছে উপসংহার।

আবাসন চিত্র ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক কর্তৃক গঠিত শহরাঞ্চল আবাসন ঘাটতি সংক্রান্ত Technical Group বা কারিগরী গোষ্ঠীর (২০১২-'১৭ : T.G.-12) হিসাব অনুযায়ী, দেশে আবাসন ঘাটতি প্রায় ১২.৭৮ মিলিয়ন ইউনিট।[৭] এদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত বা Economically Weaker Section (E.W.S.) তারাই মোট ঘাটতির ১০.৫৫ মিলিয়ন ইউনিট বা ৫৬.২ শতাংশ। নিম্ন আয় গোষ্ঠীর মানুষজনের ক্ষেত্রে যেখানে ৩৯.৪ শতাংশ বা ৭.৪১ মিলিয়ন বাসস্থানের অভাব রয়েছে সেখানে মাঝারি বা তার বেশি আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৪ শতাংশ বা ০.৮২ মিলিয়ন ইউনিট। স্পষ্টত ঘাটতি বেশিমাত্রায় প্রকট হয়েছে সুলভ আবাসনের ক্ষেত্রে (দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত

[লেখক কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহরাঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secy-mhupa@nic.in]

ও নিম্ন আয়বিশিষ্ট)। শহরাঞ্চলে আবাসনের যে ঘাটতি রয়েছে তার ৭৬ শতাংশই সীমিত রয়েছে ১০-টি রাজ্যের সম্মিলিত হিসাবে। রাজ্যগুলি হল : উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও গুজরাট (T.G. 12 : 2012)। আবাসন ঘাটতির এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার সূত্রে গৃহ নির্মাণের এক বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করার সুযোগ এসেছে।

সংশ্লিষ্ট T.G.-12 প্রতিবেদনে ১৮.৭৮ মিলিয়ন আবাসন ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হলেও ২০১১-র আদমশুমারি-র ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের নগরাঞ্চলে খালি পড়ে থাকা বাড়ির সংখ্যা ১১.০৭ মিলিয়ন। এতেই দেশের আবাসন বাজারে চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। একইভাবে দেখা যায় যে, উচ্চতর আয়বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে আবাসনের উদ্বৃত্ত থাকলেও আর্থিকভাবে দুর্বলতর এবং নিম্ন আয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘাটতির হিসাব দাঁড়িয়েছে ৯৫ শতাংশ। আরও আভাস পাওয়া যায় যে, ২০১১ সালে[৮] ভারতের শহরাঞ্চলের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী (২.৭৬) আগামী দিনে, ২০৫০[৯] নাগাদ বাড়তি জনসংখ্যা গিয়ে ৮১.৪ কোটিতে পৌঁছবে। দরিদ্রদের জন্য আবাসন ও মৌলিক সুযোগসুবিধার সংস্থান করার লক্ষ্যে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। বৃদ্ধি পেতে পারে গৃহহীন এবং স্বল্পমেয়াদি স্থানান্তরিত মানুষের সংখ্যা। জমির দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে দরিদ্র মানুষজন ঘিঞ্জি-বস্তি ও জবরদখলকারী কলোনিতে অথবা শহরসংলগ্ন ফাঁকা জমির দখল নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হন। শহরাঞ্চলের অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল উন্নয়নের এটা অন্যতম কারণ। সুতরাং সুলভ আবাসন-বাজার গড়ে তোলার পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে, যেমন, উন্নতমানের ও দায়মুক্ত জমির অভাব, ক্রমবর্দ্ধমান নির্মাণ ব্যয়, বেসরকারিক্ষেত্রের অংশগ্রহণে অনীহা, নির্ভরযোগ্য ভাড়াভিত্তিক আবাস ব্যবস্থার অভাব, দরিদ্রদের গৃহঋণ পাওয়ার সমস্যা ইত্যাদির সমাধান করাটা একান্তই জরুরি। স্বল্প ব্যয়ের নির্মাণ সামগ্রী ও নির্মাণ কৌশল নিয়ে যেসব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হয়েছে, বাজারে সেগুলি সম্পর্কে আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও রয়েছে একাধিক নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা, যেমন, দীর্ঘসূত্রী ও জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের সমস্যা, নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক বিধিনিষেধ ও মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে স্পষ্টতার অভাব।

সারণি-১
PMAY স্তম্ভ : উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ISSR	● সম্পদরূপে জমির ব্যবহার				
	● বেসরকারি অংশগ্রহণ				
	● বাড়িপিছু ১ লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় অনুদান				
	● প্রয়োজনসাপেক্ষে অতিরিক্ত FSI/TDR/FAR-এর সংস্থান রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত এলাকা দ্বারা				
BLC	● অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলশ্রেণির ব্যক্তিগত বাড়ির জন্য				
AHP	● নতুন নির্মাণ বা বর্তমান বাড়ির সম্প্রসারণে বাড়ি পিছু ১৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান				
CLSS	● বেসরকারি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা আধা সরকারি এজেন্সি দ্বারা				
	● সুলভ আবাসন প্রকল্পে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য বাড়ি পিছু ১.৫ লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান				
	● EWS, LIG ও MIG-র জন্য বিশেষ সুদ ভরতুকি				
		EWS	LIG	MIG-I	MIG-II
	পারিবারিক আয় (বার্ষিক টাকার হিসাবে)	৩,০০,০০০ পর্যন্ত	৩,০০,০০০-৬,০০,০০০	৬,০০,০০০-১২,০০,০০০	১২,০০,০০০-১৮,০০,০০০
	সুদ ভরতুকি (বার্ষিক শতাংশ)	৬.৫ শতাংশ	৬.৫ শতাংশ	৪ শতাংশ	৩ শতাংশ
	বাড়িপিছু কার্পেট এলাকা	৩০ স্কোয়ার মিটার	৬০ স্কোয়ার মিটার	৯০ স্কোয়ার মিটার	১১০ স্কোয়ার মিটার

সূত্র : কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক, ২০১৭

সরকারি পদক্ষেপ : কর্মসূচি, নীতি-নির্দেশিকা ও সংস্কার

দরিদ্রদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনোত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কয়েকটি নীতি ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে : শিল্পশ্রমিক ও দরিদ্রতর শ্রেণিভুক্তদের জন্য সুসংবদ্ধ ভরতুকিপ্রাপ্ত আবাসন কর্মসূচি (১৯৫২), নিম্ন আয় গোষ্ঠীভুক্তদের আবাসন কর্মসূচি (১৯৫৬), বস্তি উন্নয়ন/ছাড় কর্মসূচি (১৯৫৬ সালে শুরু হয়ে জাতীয় স্তরে ১৯৭৩-এ পরিত্যক্ত), শহরাঞ্চল বস্তি এলাকায় পরিবেশ বিকাশ কর্মসূচি (১৯৭২), জাতীয় বস্তি এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৬), নেহেরু রোজগার যোজনার আওতাধীন আবাসন ও আশ্রয় মানোন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৮৯-এ শুরু হয়ে ১৯৯৭-এ পরিত্যক্ত), নৈশ আশ্রয় কর্মসূচি (১৯৮৮-'৮৯), বাল্মীকি আম্বেদকর আবাস যোজনা (২০০১-'০২-তে শুরু), JNURM বা জওহরলাল নেহেরু জাতীয় নগর পুনরুজ্জীবন মিশন, রাজীব আবাস যোজনা, রাজীব ঋণ যোজনা এবং সর্বশেষ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগরাঞ্চল বা (PMAY-U)। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত তাদের নিজস্ব লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচিগুলিও রয়েছে।[১০] পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলির ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব খুবই সীমিত, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বস্তি এলাকার ধারাবাহিক বিস্তৃতিতে।

সুলভ আবাসনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একাধিক সরকারি নীতি প্রণীত হয়েছে। প্রথমবার জাতীয় আবাসন নীতি ঘোষিত হয় ১৯৮৮ সালে। কেন্দ্রে পটপরিবর্তনের দরুন ১৯৯৪ সালে একটি সংশোধিত কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। হ্যাবিট্যাট বা বসতিনির্ভর একটি নতুন আবাসন নীতি ঘোষিত হয় ১৯৯৮ সালে যেখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় আবাসনের পরিপূরক হিসাবে বসতি বা

চিত্র-১ : ISSR—গুজরাটের রাজকোটে ভারত নগর বস্তির রূপান্তর

'হ্যাবিট্যাট'-এর ওপর। এই নীতিতে কয়েকটি দিকচিহ্নজ্ঞাপক পদক্ষেপের সংস্থান রয়েছে; যার মধ্যে অন্যতম হল জমির ঊর্ধ্বসীমা ও নিয়ন্ত্রণ আইন রদ করা এবং জমি-বাড়ির ব্যবসায় সরকারি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (FDI) বৃদ্ধি ঘটানো। বৈশিষ্ট্যসূচক এই সব নীতি অবশ্য গ্রাম ও শহর এলাকা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ২০০৭ সালে যে নতুন জাতীয় শহরাঞ্চল আবাসন ও বসতি নীতি ঘোষিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল 'সকলের জন্য সুলভ আবাসন'-এর লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা। এই নীতিতে নতুন আবাসন প্রকল্পগুলিতে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত ও নিম্ন আয়ভোগীদের জন্য জমি বরাদ্দ করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নীতি রূপায়ণে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার, স্থানীয় সংস্থা, ব্যাঙ্ক, আবাসন সংক্রান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলির ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করা হয়েছিল। আবাসন ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আরও দুরূহ হয়ে ওঠায় এবার এই নীতিটিও পালটানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রকে আরও বৃহত্তর ভূমিকায় সামিল করার তাগিদ নিয়ে সরকারের তরফে একটি জাতীয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নীতি প্রণীত হয়েছে। এই নীতিতে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে বেসরকারি ক্ষেত্রকে সঙ্গে নেবার পন্থাপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ভাড়াভিত্তিক আবাসনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তুত করা হয়েছে একটি জাতীয় শহরাঞ্চল রেন্টাল আবাসন নীতি ও একটি মডেল টেনান্সি বা ভাড়াটিয়াস্বত্ব আইন।

পাশাপাশি সরকারি প্রয়াসে সূচনা হয়েছে একাধিক সংস্কার কর্মসূচির, যাতে করে সুলভ আবাসন ক্ষেত্রটি বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সব সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে অন্যতম হল স্থাবরসম্পত্তি নিয়ামক আইন বা Real Estate Regulation Act (RERA), উদারকৃত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) সংক্রান্ত আইনকানুন, স্থাবরসম্পত্তি বিনিয়োগ অছি পরিষদ বা Real Estate Investment Trusts (REITs), পণ্য-পরিষেবা কর বা GST প্রভৃতি। পয়লা মে, ২০১৭-তে চালু হওয়া RERA-র উদ্দেশ্য হল সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ লেনদেন বজায় রেখে জমিজমা সংক্রান্ত রিয়াল এস্টেট ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে করে এক দিকে লগ্নীকারীদের মধ্যে আস্থা বেড়ে ওঠে অন্য দিকে ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। গত পয়লা জুলাই চালু হওয়া জিএসটি-র লক্ষ্য হল কর সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বাধাগুলিকে অপসারিত করে এবং স্বচ্ছতা ও জোগান-শৃঙ্খলের উন্নতি ঘটিয়ে একটি একক ও সংযুক্ত বাজার সৃষ্টি করা।

অযথা প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি বা সময়ের অপচয় এড়াতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম যাতে সহজ ও মসৃণ হয় সেজন্য বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক জানালা অনুমোদন নীতি এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্মাণ পরিকল্পনা ও মালিকানাস্বত্বের, স্বীকৃতি। এছাড়াও সুলভ আবাসনকে সরকার 'পরিকাঠামো মর্যাদা' দিয়েছে, যার ফলে প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যাবে এবং বাড়ির দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই থাকবে। 'পরিকাঠামো মর্যাদা' প্রাপ্তির দরুন জোগানের দিক থেকে উৎসাহের সঞ্চার হবে এবং সুলভ আবাসন ক্ষেত্রের প্রতি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটেও (২০১৬-'১৭ এবং ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে) ইতিবাচক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাধিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে আয়কর আইনের 80-IBA ধারার আওতায় প্রত্যক্ষ করের সুবিধা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ইত্যাদি প্রস্তাবের করের সুবিধা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ইত্যাদি প্রস্তাবের শিথিলকরণ এবং সমমাপের ভিত্তিতে কার্পেট এরিয়ার ব্যবহারবিধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

PMAY-U-এর আওতায় নতুন একটি বহুধাবিস্তৃত ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি বা Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধক প্রথার উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছে। যার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর ও স্বল্প আয়ের মানুষজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণহার কমার দরুন ঘরবাড়ির ক্রেতারা যাতে সত্বর তার সুবিধা নিতে পারেন তার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR)।

শহরাঞ্চল আবাসনের নতুন মিশন

২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসনের সংস্থান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-এর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী আবাস

যোজনা-শহরাঞ্চল (PMAY-U) উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচিকে শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থা ও অন্যান্য রূপায়ণকারী এজেন্সিকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির মধ্যবর্তিতায় কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কর্মসূচিতে চারটি স্তম্ভ রয়েছে : ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি (CLSS) এবং কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত আরও তিনটি কর্মসূচি। এগুলি হল : বেসরকারি অংশগ্রহণের সাহায্যে জমিসম্পদের ব্যবহার করে বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের স্বস্থানে পুনর্বাসন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুলভ আবাসন তৈরি এবং উপকৃতদের নেতৃত্বে গৃহনির্মাণ বা সম্প্রসারণে ভরতুকি প্রদান।

আলোচ্য নতুন এই মিশন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল থেকেছে। যেমন তাদের নিজ নিজ আবাসনের চাহিদা মেটাতে উল্লিখিত চারটি স্তম্ভের মধ্যে বেছে নেবার সুযোগ রাজ্যগুলির রয়েছে। রাজ্যগুলিকে অবশ্য মিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রকল্প রচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প রূপায়ণে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে PMAY-তে প্রবর্তন করা হয়েছে অন্তর্গ্রথিত নমনীয়তা, চাহিদামুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিটি স্থানীয় সংস্থার জন্য একটি সুসংবদ্ধ 'সকলের জন্য আবাসন' কর্মপরিকল্পনা।

বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত না করে স্বস্থানে বস্তির পুনঃবিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্পে বা 'In-Situ Slum Redevelopment' (ISSR)-এর ক্ষেত্রে বেসরকারি ডেভেলপারদের জমি এবং আর্থিক উৎসাহ দিয়ে চিহ্নিত জমির একাংশে নিম্ন আয়গোষ্ঠী, বিশেষ করে বস্তিবাসীদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। বস্তি এলাকার পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন ছাড়াও এক্ষেত্রে বেসরকারি ডেভেলপাররাই নিজেদের দায়িত্বে নির্মাণ কাজ চলাকালে সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসীদের থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত করে থাকেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার অঙ্গীকার এই কর্মসূচিতে রয়েছে।[১১] এলাকার পুনর্গঠন সম্পন্ন হবার পর শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থার পক্ষ থেকে তা 'ডিনোটিফাই' করতে হবে। বৈধ বস্তিবাসীদের

চিত্র-২ : BLC—তামিলনাড়ুর ভেলোরে

(বেসরকারি জমিতে অবস্থিত বস্তিগুলি বাদে) আবাসন তৈরি করার জন্য গড়পড়তা বাড়ি পিছু ১ লক্ষ টাকা হিসাবে পুনর্বাসন অনুদান রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে।[১২]

ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি বা Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)-এর আওতায় গোড়ার দিকে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্তদের গৃহঋণের ক্ষেত্রে ভরতুকি দেওয়া হ'ত। ২০১৭-তে ওই কর্মসূচির পরিধি এক বছর বাড়িয়ে মাঝারি আয়ভোগীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ঋণ-পরিমাণের ভিত্তিতে সুদে-ভরতুকির হার ৩ থেকে ৪ শতাংশে সীমিত রাখা হয় (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। নতুন নির্মাণ কাজ বা পুরোনোবাড়িতে নতুন কামরা তৈরির জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। দুর্বলতর শ্রেণিগুলির ক্ষেত্রে (৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত) এবং নিম্ন আয়ভোগীদের ক্ষেত্রে (৬০ বর্গমিটার পর্যন্ত) গৃহনির্মাণ ঋণবাবদ ৬.৫ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে, যা পাওয়া যাবে ১৫ বছর মেয়াদে। এই ভরতুকি অবশ্য শুধুমাত্র ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে।[১৩] ঋণদাতা সংস্থাগুলির জন্য ভরতুকি জোগানো ও কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে আবাসন ও নগর উন্নয়ন নিগম (হাডকো) এবং জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্কের (N.H.B.) ওপর।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুলভ আবাসন বা 'Affordable Housing on Partnership'-র ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিগুলিকে আবাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, যখন সেগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে নির্মীয়মাণ। আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিগুলিকে এক্ষেত্রে আবাসন পিছু দেড় লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়।[১৪] আবাসনের সুলভতা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্পেট এলাকার বর্গমিটারপিছু হিসাবে বিক্রয় মূল্য (সর্বোচ্চ সীমা) ধার্য করা হয়ে থাকে। রাজ্যগুলির উদ্যোগে ভরতুকির সংস্থান, জমি ও স্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এধরনের প্রকল্পগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত আবাসন থাকতে পারে, তবে মোট আবাসনের অন্তত ৩৫ শতাংশ আর্থিকভাবে দুর্বলতরদের জন্য বরাদ্দ করার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।

আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত একক বৈধ পরিবারগুলির ক্ষেত্রে নতুন বাড়ি নির্মাণ বা বর্তমান আবাসনের মানোন্নয়নে দেড় লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় সাহায্যের সংস্থান রয়েছে উপকার প্রাপকের নেতৃত্বে গৃহনির্মাণ কর্মসূচি বা Beneficiary-led Housing Construction (BLCH)-এর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে উপকার প্রাপককে যথাযথ প্রমাণপত্র-সহ নগরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থার (ULB) কাছে আবেদন জানাতে হবে। প্রাপ্ত

আবেদনপত্রগুলির ভিত্তিতে ওই সংস্থার উদ্যোগেই একটি সুসংবদ্ধ শহরব্যাপী আবাসন প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।[১৫]

শুরু হবার পর থেকে আবাসন মিশনের আওতায় প্রায় ২৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ বাড়ির। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দবিশিষ্ট যে, ৫১৪৭-টি প্রকল্প বিবেচিত হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৭ হাজার ২৭০ কোটি টাকা। ৩১ জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত (সারণি-২ দ্রষ্টব্য) গৃহীত হিসাবে দেখা যাচ্ছে CLSS-এর জন্য ৪৮,৮৬৩-টি নতুন বাড়ি তৈরি খাতে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে ৯৬২ কোটি টাকা। প্রকল্প রূপায়ণের কাজ কী অবস্থায় রয়েছে তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির দ্বারা। উন্নতমানের নকশা ও কারিগরি প্রকৌশল গ্রহণের ফলে অনুমোদিত নির্মাণ প্রকল্পের কাজে গতি এসেছে। BLO প্রকল্পগুলিতে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নজরদারির জন্য জিও-ট্যাগিং-এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং উপকৃতদের সকলকেই আধার-যুক্ত করা হয়েছে।

আবাসন কর্মসূচিগুলিতে উদ্ভাবনমূলক সুস্থায়ী আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি গ্রহণ করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। PMAY-U-এর আওতায় গোটা প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করার জন্য গঠন করা হয়েছে একটি প্রযুক্তি সহায়ক মিশন। এর দ্বারা বিভিন্ন ভূ-আবহাওয়া অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুণমানবিশিষ্ট নির্মাণ, সবুজ প্রযুক্তি এবং নমনীয় নকশা বিন্যাসকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সহায়ক মিশনের সাহায্যে বিভিন্ন এজেন্সি, নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রশাসনিক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হচ্ছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজকে যাতে আরও বেশি বিপর্যয় রোধক ও সুস্থায়ী প্রকৌশল-নির্ভর করে তোলা যায় তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। নকশা প্রণয়নের সময় স্থানিক উপযোগিতা যাচাই করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আবাসনের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে স্থানীয় স্তরে নির্মিত ইট ও অন্যান্য নির্মাণ

সারণি-২
৩১ জুলাই, ২০১৭ অবধি PMAY-র অবস্থা

ক্রমিক সংখ্যা		রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত এলাকার নাম	বিবেচিত প্রকল্প প্রস্তাব	মিশনে এপর্যন্ত মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকার হিসেবে)	কেন্দ্রীয় সাহায্য (কোটি টাকার হিসেবে)	নির্মীয়মান বাড়ি
১.	রাজ্য	অন্ধ্রপ্রদেশ	২০৭	২৪৮৩৯.৮৬	৬৩২৪.২৯	৪২০৩৮৬
২.		বিহার	১৮০	৩৯১১.১৮	১৪৫৪.৩৯	৮৮৩৭১
৩.		ছত্তিশগড়	৬৯	২৯৬৪.৩৯	৫১৭.০৫	৩৫৩৫৭
৪.		গোয়া	—	১.৪৬	০.৩৬	২০
৫.		গুজরাট	১৭৪	১০৩৭৭.৬৮	২২৫৬.১৫	১৫৬৪৯৩
৬.		হরিয়ানা	৫	৩৪১.২২	২২৭.৫৩	৪৪৭৪
৭.		হিমাচলপ্রদেশ	৩৬	২২১.৯২	৯৬.৫৮	৪৮৯৭
৮.		জম্মু ও কাশ্মীর	৪৪	২৯২.৩২	১০৪.২৩	৬২৫০
৯.		ঝাড়খণ্ড	১৮৪	৩০৩১.৮৯	১২৬৪.০৬	৮১৭২৫
১০.		কর্ণাটক	৮৪২	৯২৫১.১৯	৩৩৪২.৪৩	২০৩১৪৫
১১.		কেরালা	১০৬	১০৮২.৫৫	৫১৭.৫২	৩২৬৪২
১২.		মধ্যপ্রদেশ	৩৬৮	১৯৪৫২.৬১	৪৪১১.৫১	২৮৬৯৪৯
১৩.		মহারাষ্ট্র	৪৯	১৪১৪৪.৬৮	২০৬৯.০০	১৩৩০৪৩
১৪.		ওড়িশা	১১৬	২৬৬৩.৭৮	৯৭৬.৬৬	৫৯৫২৫
১৫.		পাঞ্জাব	৩২৯	১২১৪.৯০	৬০৪.৪১	৪২৯০৫
১৬.		রাজস্থান	৬৫	৩১৯০.৪৫	৭৯০.১৯	৪৪৭৬৩
১৭.		তামিলনাড়ু	১৬৩৪	১১৯৪৫.২৪	৫০৮৭.১৮	৩৩৪৮০১
১৮.		তেলেঙ্গানা	১৪৬	৫০০৩.৪৪	১২৫৩.১২	৮৩০৯৪
১৯.		উত্তরপ্রদেশ	২৫৬	৩২৬২.০৭	১৩৩৯.১৩	৭৮৭২৭
২০.		উত্তরাখণ্ড	৪১	৫১৬.৫২	২০৩.৫২	৮০৭২
২১.		পশ্চিমবঙ্গ	১৫৩	৫৯০৩.৭২	২১৮৪.৭০	১৪৪৮৬২
		সাব-টোটাল (রাজ্য)	**৫০০৪**	**১২৩৬১৩.০৯**	**৩৫০২৪.০২**	**২২৫০৫০১**
২২.	উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য	অরুণাচলপ্রদেশ	৫	৯৮.১৬	৭৮.৪৪	১৬০৬
২৩.		আসাম	৪৭	১২৪৭.৭৮	৫৪৮.৮৯	৩৬৫৭৭
২৪.		মণিপুর	২৪	৬৭৯.৫২	৩৯৬.৭২	২৬৪৫১
২৫.		মেঘালয়	৮	৩২.২৩	১১.৫১	৭৬৪
২৬.		মিজোরাম	৯	২২২.৯২	১৬৫.২৯	১০৫৫২
২৭.		নাগাল্যান্ড	১৩	৩৩৫.০৩	২২৯.২৭	১৩৫৬০
২৮.		সিকিম	১	১.৯৫	০.৬৫	৪৩
২৯.		ত্রিপুরা	২৪	১২৬৭.৪৯	৭২২.৫৭	৪৫৯৭২
		সাব-টোটাল (উত্তর-পূর্ব রাজ্য)	**১৩১**	**৩৮৮৫.০৯**	**২১৫৩.৩৪**	**১৩৫৫২৫**
৩০.	কেন্দ্রশাসিত এলাকা	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩	৫৩.৯৬	৯.১৪	৬০৯
৩১.		চণ্ডীগড়	—	১.২৯	০.২১	১০
৩২.		দাদরা ও নগর হাভেলি	১	৩৯.৩২	১৫.১২	৯৪৬
৩৩.		দমন ও দিউ	২	৫.০৬	২.১১	১৩৬
৩৪.		দিল্লি	—	৫০.১৮	৮.৯১	৪৬৮
৩৫.		লাক্ষাদ্বীপ	—	—	—	—
৩৬.		পুদুচেরি	৬	১৬২.৮১	৫৮.০১	৩৮৬৬
		সাব-টোটাল (UT)	**১২**	**৩১২.৬৩**	**৯৩.৪৯**	**৬০৩৫**
		গ্র্যান্ড টোটাল	**৫১৪৭**	**১২৭৮১০.৮১**	**৩৭২৭০.৮৪**	**২৩৯২০৬১**

সূত্র : কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক, ২০১৭

চিত্র-৩ : BLC—জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে

সামগ্রী ব্যবহারের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং লক্ষ্য রাখা হচ্ছে সিমেন্টসম্পৃক্ত মৃত্তিকা বা ফ্লাই অ্যাশের মতো সুলভ প্রকৌশল ব্যবহার করার ওপরও।[১৬] সুস্থায়ী ও সুসংবদ্ধ ও সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে জ্বালানি-দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিও কর্মসূচির নির্দেশিকায় স্থান পেয়েছে। হাতেকলমে প্রদর্শনের সাহায্য নিয়ে নতুন প্রযুক্তির আবাসন নির্মাণে ১৩-টি রাজ্যকে আগ্রহী করে তোলার প্রয়াসও শুরু হয়েছে।

আবাসন মিশনের সঙ্গে অন্যান্য নগরোন্নয়ন মিশনের সমকেন্দ্রিকতা

নগরোন্নয়ন কর্মসূচিগুলিকে সমন্বিত করা হলে সামাজিক ও বাহ্যিক পরিকাঠামোযুক্ত আবাসনের চাহিদা সত্বর পূরণ করা সহজ হয়ে ওঠে।

'Smart Cities Mission (S.C.M.)'-কে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ফ্ল্যাগ মিশন বলা যেতে পারে। মিশনটির উদ্দেশ্য হল সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে চিহ্নিত শহরগুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং নাগরিকদের জীবনযাপনকে উচ্চমানে পৌঁছে দেওয়া।[১৭] 'স্মার্ট সিটি' বিকাশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব রয়েছে তার মধ্যে আবাসন অন্যতম। 'স্মার্ট সিটি'-র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, যার ফলে ঘিঞ্জি বস্তি-সহ বর্তমান এলাকাগুলির পরিকল্পিত পুনর্গঠন ঘটবে এবং সমগ্র শহরই আরও উন্নতমানের হবে। বেশ কয়েকটি স্মার্ট সিটি প্রস্তাবে আবাসনের উন্নয়ন গুরুত্ব পাওয়ায় এগুলির সঙ্গে PMAY-এর সমকেন্দ্রিকতা স্থাপিত হবে।

'Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation' বা নগরাঞ্চল পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তর সংক্রান্ত অটল মিশনে আবাসনের মৌলিক পরিকাঠামো গড়ার কয়েকটি সংস্থান রয়েছে। এগুলি হল : প্রতিটি বাড়িতে জল ও শৌচালয় সংযোগ, উন্মুক্ত জায়গার উন্নয়ন এবং ভ্রাম্যমাণ ব্যবস্থার সাহায্যে দূষণ হ্রাস। দেশের ৫০০-টি শহর এই মিশনের আওতাভুক্ত।[১৮] কর্মসূচিগুলির সঙ্গে সমকেন্দ্রিকতা বজায় রাখলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রেরও উন্নতি ঘটবে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের (নগরাঞ্চল) উদ্দেশ্য হল উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ বন্ধ করা, মানুষের দ্বারা আবর্জনা বহন নিষিদ্ধ করা এবং পৌর এলাকায় কঠিন বর্জ্য পদার্থের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা। মিশনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল বাড়ির অভ্যন্তরে শৌচাগার নির্মাণ। PMAY-এর সঙ্গে আলোচ্য মিশনের সমকেন্দ্রিকতা অনাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়ক হবে।[১৯]

দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় শহরাঞ্চল জীবিকা সংস্থান মিশন বা 'National Urban Livelihood Mission' (DAY-NULM)-এ শহরাঞ্চলীয় আশ্রয়হীনদের স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সুযোগ পৌঁছে দেবার সংস্থান রয়েছে। এটির আরও উদ্দেশ্য হল শহরাঞ্চলীয় আশ্রয়হীনদের, বিশেষ করে দুর্বল ও অসহায় মানুষদের বিশেষ চাহিদাগুলি পূরণ করা।

এছাড়াও রয়েছে জাতীয় নগরাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য মিশন বা National Urban Health

চিত্র-৪ : AHP—ছত্তিশগড়ের রাইপুরে

Mission। এই মিশনে শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ দেবার এবং তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয় লাঘব করার সংস্থান রয়েছে। মিশনটির সঙ্গে সমকেন্দ্রিকতা থাকায় PMAY সার্বিকভাবে আরও ফলপ্রসূ হবে।

উপসংহার

২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসনের জাতীয় লক্ষ্যপূরণে অগ্রগণ্য শর্ত হল সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক প্রয়াস। প্রয়োজন রয়েছে সেরা পদ্ধতি অবলম্বন করে উন্নতমানের কাজকর্ম পরিচালনার। সংবিধানে 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন' রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, তাই মিশনকে সার্থক করে তুলতে রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যগুলিকে অবশ্যই এমন একটি সুসংবদ্ধ আবাসন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে অগ্রাধিকার পাবে সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো। নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি রাখতে হবে আবাসন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনার দিকটির ওপরও। শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের দাবি মেটাতে স্বল্পব্যয়বিশিষ্ট প্রকৌশল ও দ্রুত সম্পন্নযোগ্য নির্মাণ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে ব্যাপক মাত্রায়। আর এভাবেই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন এজেন্সি-সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মিলিত অঙ্গীকারই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভিসন-কে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে এবং ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আগেই পূরণ হবে সকলের জন্য আবাসনের স্বপ্ন।❑

পাদটীকা :

1. Economic Survey, 2016-'17 pg 300.
2. http://www.iimb.ernet.in/sites/default/files/u201/Housing%20market%20inl%20India.pdf.
3. http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-New-Urban-Agenda-10-September-2016.pdf.
4. https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.
5. http://unfcc.int/paris_agreement/items/9444.php.
6. http://niti.gov.in/writereaddata/files/Mapping-SDGs%20V19-Ministries%20Feedback%20060416_0.pdf.
7. This estimates is based on Census & NSSO 65th Round results on Housing conditions and Urban Slums (July 2008-June 2009) with usual inputs like obsolescence factor, congestion factor & homeless households. Taking into account the fact that the shortage in housing is significant in lower income group, for 2012, TG-12 distributed the shortage on the basis of State's contribution to the total, on the basis of average of total number of households below poverty line in urban areas and households with *kuchcha* houses in urban areas. In the past, national level housing shortage was distributed among the states in proportion to number of urban households.
8. Census of India, 2001 and 2011
9. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects : The 2014 Revision.
10. National Resource Center, School of Planning and Architecture, New Delhi (2009), Affordable Housing for Urban Poor.
11. Patel, 2016. Available at : http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/Affordable-housing-must-be-distributed-and-inclusive/article14308414.ece.
12. Research policy paper : Housing for All, 2016. Available at : http://www.swaniti.com/wrp-content/uploads/2016/07/Housing_For_all.pdf.
13. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, HFA Guidelines for CLSS, 2017. Available at : http://moud.gov.in/upload/uploadflies/flies/4CLSS_LIG_English_Guidelines_wb.pdf.
14. Available at : http://www.indianeconomy.net/splclassroom/348/what-is-housing-for-all-by-2022-mission/
15. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, HFA Guidelines, 2015. Available at : http://hudco.org/writereaddata/PMAY.pdf.
16. PMAY Guidelines, 2015.
17. Smart city Guideline, 2015. Available at : http://smartcities.gov.in/upload/uploadflies/files/SmartCityGuidelines(1).pdf.
18. Ministry of Urban Development, AMRUT guidelines, 2016. Available at : http://moud.gove.in/cms/amrut.php.
19. Swachh Bharat Mission Guidelines, 2017. Available at : http://www.swachhbharaturban.in/sbm/home/#/SBM.

উল্লেখপঞ্জি :

Government of India. (2012). "Report of the Technical Group on Urban Housing Shortage (2012-2017)", Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and National Buildings Organisation.

MoHUPA, GoI. "Pradhan Mantri Awas Yojana. Housing for All (Urban)-Scheme Guidelines". Indian Government : 2015.

MoHUPA, GoI. "Pradhan Mantri Awas Yojana. Housing for All Guidelines for CLSS, 2015.

MoUD, GoI. Smart city Guideline, 2016.

MoUD, GoI. AMRUT Guideline, 2016.

MoUD, GoI. Swatch Bharat Guideline, 2016.

National Urban Housing and Habitat Policy, 2007.

Patel, Shirish B., 2016. "Affordable Housing must be distributed and inclusive." The Hindu. Available at : http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/affordable-housing-must-be-distributed-and inclusive/article8088463.ece (Accessed : 10th August 2017).

Registrar General of India, Government of India. (1991, 2001, 2011). "Primary Census Abstract, 1991, 2001 and 2011", *Census of India*.

Registrar General of India, Government of India (2001, 2011). "Houses, Household Amenities and Assets 2001 and 2011", *Census of India*.

School of Planning and Architecture, National Resource Center, Affordable Housing for Urban Poor New Delhi, 2009.

Swaniti Initiative, 2016. Housing for all : Research policy paper. Available at : http://www.swaniti.com/wp-content/uploads/2016/07/Housing_For_all.pdf.

Teri, USAID, 2016 (Policy Brief). Available at : http://www.teriuniversity.ac.in/wash/pdf/Policy%20Brief-Swacch%20Bharat%20Mission-Final-020316.pdf.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2014), "World Urbanization Prospects : The 2014 Revision".

জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং সকলের জন্য আবাস

অম্লানজ্যোতি গোস্বামী, গৌতম ভান

কম আয়ের পরিবারের সংজ্ঞা কী হবে, সুলভ আবাসনের খরচ এবং আয়তন কেমন হবে, কোন ধরনের সুবিধা থাকলে তাকে পর্যাপ্ত বলা যাবে—এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। তৃতীয় একটি বিষয় কিন্তু গুরুত্ব পায়নি। তা হল কার্যকারিতা। এখানে আবাসনের জায়গার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল সেখানে আদতে সুষ্ঠু জীবনযাপন কতটা সম্ভব তা নিয়ে ভাবতে হবে অবশ্যই। আবাসন তৈরির খরচ এবং সেখানে কী ধরনের সুযোগসুবিধা মিলবে তার পাশাপাশি এই বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। সরকারের তৈরি আবাসনে যাতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেটা নিশ্চিত করতে এছাড়া গতি নেই।

পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং সুলভ আবাসনের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে জমির অপ্রতুলতা, অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

সর্বশেষ পাওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে চাহিদার নিরিখে উপযুক্ত গৃহের সংখ্যায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ ঘাটতি (কুণ্ডু কমিটি, ২০১২)।[i] এর ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে (সংখ্যায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ), একটা গৃহকাঠামো হয়তো আছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। তাই, এখানকার বাসিন্দাদের একেবারে গৃহহীন বলা চলে না। মনে রাখা দরকার যে শহর এলাকায় আবাসনের সমস্যাটা প্রধানত সুযোগসুবিধার দিক থেকে। বহু ক্ষেত্রেই মানুষের মাথার ওপরে ছাদটুকু আছে এই যা। সেই নিরিখে এরা গৃহহীন নন। কিন্তু যথার্থ আবাসন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে ২ কোটি নতুন গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কিন্তু আরও অনেক খারাপ। গ্রাম ভারতের ৫৬ শতাংশ পরিবার বাস্তুহারা।[ii] এই দু'টি ছবি পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা দরকার। ভারতে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং তার প্রেক্ষিতে নগরাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সাযুজ্যের অভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা করতে এখন যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক। এখানে তিনটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম দু'টি, অর্থাৎ পর্যাপ্ততা এবং সহজলভ্যতার ব্যাপারে নগরাঞ্চলের আবাসন নীতিতে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

কম আয়ের পরিবারের সংজ্ঞা কী হবে, সুলভ আবাসনের খরচ এবং আয়তন কেমন হবে, কোন ধরনের সুবিধা থাকলে তাকে পর্যাপ্ত বলা যাবে—এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। তৃতীয় একটি বিষয় কিন্তু গুরুত্ব পায়নি। তা হল কার্যকারিতা। এখানে আবাসনের জায়গার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল সেখানে আদতে সুষ্ঠু জীবনযাপন কতটা সম্ভব তা নিয়ে ভাবতে হবে অবশ্যই। আবাসন তৈরির খরচ এবং সেখানে কী ধরনের সুযোগসুবিধা মিলবে তার পাশাপাশি এই বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। সরকারের তৈরি আবাসনে যাতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেটা নিশ্চিত করতে এছাড়া গতি নেই। পরিসংখ্যান বলছে, আগেকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সরকারের গড়ে দেওয়া আবাসস্থলগুলির প্রতি তিনটির মধ্যে মাত্র একটিতে স্থায়ীভাবে বাস করেন মানুষ। এই পরিস্থিতি পালটানো জরুরি।

কম আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (ক) বাসস্থানের কাছাকাছি কাজকর্ম এবং জীবিকার সুযোগ কতটা; (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা (গণপরিবহণের ব্যবস্থা

[লেখকদ্বয় Indian Institute for Human Settlements-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : agoswami@iihs.co.in, gbhan@iihs.co.in]

ঠিকঠাক কি না); (গ) স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল কাছাকাছি কিনা, সামাজিক মেলামেশার সুযোগ কতটা ইত্যাদি।[iii] এই বিষয়গুলির দিকে নজর না দিলে, বিশেষত চাকরিবাকরি এবং জীবিকাসংস্থানের জায়গার নৈকট্যের দিকটি মাথায় না রাখলে, সুলভ আবাসন নীতি কখনই ফলপ্রসূ হবে না। আবাসনে জায়গা এবং এলাকার বিষয়টি গুরুত্ব না পেলে 'বাড়ি' কখনই 'গৃহ' হয়ে উঠবে না। আবাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় এই দিকটিতে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement—LARR)-এর নীতি প্রণয়নের সময় শহরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের শ্রেণিবর্গকে কোনও ক্রমে আধা গ্রাম-আধা শহর এলাকার দিকে ঠেলে দিয়ে যদি কাজ সারতে চাওয়া হয় তাহলে তৈরি হওয়া আবাসনে মানুষ বাস করতে যেতে নাও চাইতে পারেন।

কাজেই, জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (LARR) আইনের সাহায্যে কয়েকটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, দেখতে হবে সকলের জন্য আবাসনের লক্ষ্যের দিকে কার্যকরভাবে এগোনো যাচ্ছে কি না? এজন্য জমি অধিগ্রহণ বা টুকরো জমিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া, তার উন্নয়ন, গৃহঋণের সুদে ভরতুকি—সব দিকেই জোর দিতে হবে। সবসময় নজর রাখতে হবে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে জমির জোগান, এলাকাগুলির বিবর্তনের ওপরে।

দেখা যাক জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন আইন (LARR) কী বলে? সেখানে :

(ক) সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট আয়ভুক্তদের আবাসন প্রকল্পের জন্য [S.2(1)(d)];

(খ) গ্রাম ও শহর এলাকায় দুর্বলতর গোষ্ঠীভুক্তদের আবাসন তৈরির জন্য [S.2(1)(e)];

(গ) দরিদ্র্য, ভূমিহারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দা অথবা সরকারি কোনও প্রকল্পের জন্য বাস্তুচ্যুতদের জন্য জমি অধিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।[iv]

এসব ক্ষেত্রেই জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণের সংস্থান রয়েছে। তাছাড়া, সরকার যখন বেসরকারি-সরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করে, তখন এলাকার বাসিন্দাদের সম্মতি নিতে হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতাধীন ৮০ শতাংশের সম্মতি প্রয়োজন। পুরোপুরি বেসরকারি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ হলে ৯০ শতাংশ বাসিন্দার সম্মতি নিতে হবে। সুতরাং, সাধারণ মানুষের কল্যাণে গৃহীত প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ। সুলভে আবাসন নির্মাণের বিষয়টিকে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হয়, এটা ভালো কথা। কিন্তু সেজন্য জমি অধিগ্রহণ সফলভাবে হয়েছে, এমন নজির সবসময় মেলে না। বেশি গুরুত্ব পায় পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলি।

LARR আইন মোতাবেক, সরকারের বিশেষ ক্ষমতাবলে জমি অধিগ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারীদের অন্য জায়গায় থাকার সুযোগ করে দিতে বাড়িঘর-সহ ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এই বিষয়টি শহরের নিম্ন আয়ের মানুষ বা গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীনদের জন্য আবাসনের সংস্থানের সঙ্গে চরিত্রগত দিক থেকে অবশ্যই আলাদা। জমি অধিগ্রহণের ফলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির পুনর্বাসন-এর জন্য LARR আইন অনুযায়ী তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বলে বিবেচিত হওয়া জরুরি। শুধুমাত্র জমি বা বাসা হারানোরাই নন, জমি অধিগ্রহণে যাদের জীবিকাসংস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হল, তারাও এই ক্ষতিপূরণভিত্তিক সুবিধা পেতে পারেন। যেসব কৃষিশ্রমিক, ভাড়াটে, ভাগচাষি, কারিগর অধিগ্রহণের আওতায় চলে আসা জায়গায় কমপক্ষে তিন বছর বসবাস করছেন, তারা এই সংস্থান অনুযায়ী সুবিধাপ্রাপক হওয়ার যোগ্য। একইভাবে এই সুবিধার দাবিদার অধিগৃহীত বনাঞ্চলে বসবাসকারীরাও। এই বিষয়টি কার্যকর করা কিন্তু মোটেও সহজ নয়।

সরকার যদি বিশেষ ক্ষমতাবলে অধিগ্রহণের পথে না হেঁটে বিভিন্ন মালিকানায় থাকা ছোটো ছোটো জমিকে জুড়ে (Land Pooling) অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা করতে চায়, তাহলেও সকলে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ যাতে পায়, তা দেখতে হবে। এখানে বিষয়টি বেশ জটিল। এই ধরনের Land Pooling-এর ক্ষেত্রে জমির মালিকরা নতুন প্লটের একটা অংশ পান ঠিকই। কিন্তু যাদের আগে জমি ছিল না, অথচ ওই এলাকা থেকে জীবিকার প্রয়োজনটুকু মেটাতেন, তারা সবকিছু থেকে বাদ পড়ে যান। এই বঞ্চনা দূর করতে পৃথক সংস্থান থাকা উচিত।

কাজেই, আমাদের সামনে মূলত দু'টি চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, LARR আইন প্রয়োগ অথবা জমির জোগাড়যন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাকে মেনে নিয়ে তার নিরসনের চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, আবাসনের জন্য LARR আইন প্রয়োগের অনীহা থেকে মুক্ত হওয়া।

এই চ্যালেঞ্জগুলির প্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা PMAY কী করতে চায় এবং কী করে না তা বুঝে দেখতে হবে। PMAY প্রধানত চারটি দিকে জোর দেয়।

(ক) বেসরকারি কারবারিদের কাজে লাগিয়ে জমির ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

(খ) দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের গৃহঋণের সুদে ভরতুকি দেওয়া।

(গ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের রাস্তায় হাঁটা। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা দেবে। নির্মিত বাড়িগুলির ৩৫ শতাংশ রাখা থাকবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য।

(ঘ) অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর পরিবারগুলিকে নিজেদের বাড়ি তৈরি বা তার মেরামত ও সংযোজনে ভরতুকি দেওয়া (BLC)।[v]

কাজেই দেখা যাচ্ছে LARR আইনের মাধ্যমে আবাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের পথে এগোলেও মালিকদের সম্মতি, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, সামাজিক প্রভাব—এ বিষয়গুলি নিয়ে বিশদে চিন্তা জরুরি। আর অধিগৃহীত জমি যাতে আবাসন তৈরির কাজেই লাগে, অন্য কোন, লক্ষ্যে ব্যবহৃত না হয়

তাও দেখতে হবে। এই সব উদ্যোগে তৈরি হওয়া বাড়িঘরদোরে মানুষ যাতে বসবাসে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও এখানে আবার উঠে আসে।

এক্ষেত্রে, যেসব জমিতে বাড়ি রয়েছে, অথচ তা উপযুক্ত গুণমানের নয়, তা ব্যবহার করার বিকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। PMAY-তে এ সংক্রান্ত সংস্থানও রয়েছে। কিন্তু এই যোজনার আওতায় আগেকার বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন করে বাড়ি তৈরি করারই অনুমতি রয়েছে। পুরোনো বাড়ি সারিয়েসুরিয়ে নিয়ে নতুন রূপ দেওয়ার কথা বলা নেই। আর যেসব পরিবারের পাকা বাড়ি বা সব আবহাওয়ায় বসবাসযোগ্য বাড়ি আছে, তারা PMAY-এর আওতায় আসতে পারেন না।[vi]

এই সব সমস্যা মেটাতে অনেক রাজ্যই তাদের নিজেদের আবাসন নীতির পরিসর বাড়িয়েছে। কর্ণাটক সরকার ২০১৬ সালে যে সুলভ আবাসন নীতি গ্রহণ করেছে তাতে, যেভাবে এগোনোর সংস্থান রয়েছে তাকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) উপভোক্তাদের নিজ বাড়ির পরিকাঠামো উন্নত করতে ভরতুকি-সহ নানা সুবিধা প্রদান (Beneficiary Led House Enhancement), (খ) উপভোক্তাদের নিজের নতুন বাড়ি তৈরি করতে ভরতুকি-সহ নানা সুবিধা প্রদান, (গ) জমিতে থাকা বাড়ির কাঠামোটুকু রেখে তার গুণগত উন্নয়ন, (ঘ) জমিতে পড়ে থাকা বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি, (ঙ) নির্দিষ্ট জমির প্লট বেছে তাতে বাড়িঘরদোর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করা, (চ) সঙ্ঘবদ্ধ আবাসন প্রকল্প, (ছ) অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুলভ আবাসন তৈরি করা।[vii] এর মধ্যে PMAY-তে শুধুমাত্র (খ), (চ) এবং (ছ) বিকল্পগুলিই রয়েছে।

তাহলে কীভাবে এগোনো যায়? বড়ো শহরগুলিতে আবাসন তৈরির পাশাপাশি নতুন নতুন শহর এবং অঞ্চলে আবাসনের চাহিদা ভবিষ্যতে কতটা এবং কী ধরনের হতে পারে তা নিয়ে ভাবতে হবে। শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও প্রতিস্থাপন (LARR)-এর নীতি ধরে এগোলে চলবে না। জমির ব্যবহারে নৈপুণ্য এবং নিরপেক্ষতা জরুরি। আবাসন প্রকল্পগুলির কিছু অংশ সুলভ আবাসনের জন্য সংরক্ষিত রাখার রীতি বহু পুরোনো। তার প্রয়োগ হওয়া দরকার সঠিকভাবে। নতুন নগর পরিকল্পনায় জমির কিছুটা অংশকে সুলভ আবাসন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে রাখার উদ্যোগ বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। এতে, ওই জমি অন্য কাজে ব্যবহৃত হওয়া আটকানো যাবে। সুলভ আবাসনের বাসিন্দারা সন্নিহিত নগর এলাকার সব সুবিধাও পাবেন। রাজস্থান সরকার তার ২০১৫ সালের সুলভ আবাসন নীতির আওতায় কোটা এবং যোধপুরে এধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। ফাঁকা জমিতে বেসরকারি নির্মাণ সংস্থা আবাসন প্রকল্পের কাজ করছে। পরিবর্তে ২৫ শতাংশ বাড়ি রাখছে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর মানুষের জন্য। রাঁচি মাস্টার প্ল্যান ২০৩৭-এও এধরনের উদ্যোগের কথা বলা আছে। রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে তফাৎ হল এই যে, এক রাজ্যে আবাসন প্রকল্পে সুলভ আবাসনের জন্য নির্দিষ্ট অংশ চিহ্নিত আছে, অন্য রাজ্যে পুরো একটি নতুন শহর এলাকাতেই নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত আছে সুলভ আবাসনের জন্য। একসঙ্গে দু'ভাবেই এগোনো যেতে পারে। তবে শহর এলাকায় সুলভ আবাসন অঞ্চল চিহ্নিত করার উদ্যোগ না থাকলে প্রকল্প ভিত্তিক উদ্যোগ ততটা সফল নাও হতে পারে।

এই সার্বিক প্রেক্ষাপট থেকেই সুলভ আবাসনের জন্য LARR আইনের প্রয়োগের বিষয়টিকে দেখতে হবে। ওই আইনের পুনর্বাসন এবং প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত সংস্থানে বাস্তুচ্যুত গ্রামীণ পরিবারগুলির স্বার্থরক্ষার কথা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাড়ির জন্যে হন্যে হয়ে থাকা নগরাঞ্চলের মানুষজনের কথা ভাবাও একান্ত জরুরি। সমগ্র উদ্যোগকে যথার্থভাবে সফল করে তুলতে আবাসন এলাকায় সঠিক পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন—একথা সবসময় মনে রাখতে হবে। না হলে সব উদ্যোগই নিরর্থক হতে বাধ্য।

গ্রামের ভূমিহারাদের অবর্ণনীয় অবস্থার দিকে এখনই নজর দিতে হবে। তাদের আবাসনের সংস্থানে LARR একটি আইনি পথ ঠিকই, কিন্তু এধরনের প্রয়াস বহুক্ষেত্রেই ভূমি সংস্কারের মতো জমির হাতবদল ঘটায় মাত্র। মধ্যপ্রদেশে আবাসন নিশ্চয়তা আইনের পথে এগোনো হয়েছে। তা সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস।

এটা স্পষ্ট যে দেশের মানুষের কাছে সুলভ আবাসনের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিরাট কর্মযজ্ঞে LARR আইন নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু পালন করে—এই যা। আবাসনের যথার্থ ব্যবহার হবে কি না তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবাসনস্থলের অবস্থান। বর্ধিত নগর অঞ্চলে সুলভ আবাসনের চিহ্নিত জায়গা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তার সঙ্গে বর্তমান আবাসস্থলগুলির উন্নয়নে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করা এবং সহায়তা দেওয়া দরকার। শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আবাসন পরিকাঠামোর উন্নতিতে এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। সরকারের বিশেষ ক্ষমতাবলে জমি অধিগ্রহণ করে, অথবা সরকারি উদ্যোগে জমি জোগাড় করে আবাসনের ব্যবস্থা করার নীতির কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমতে বাধ্য। নীতি নির্ধারণে এই দিকটি মাথায় রাখতে হবে।❑

তথ্যপঞ্জি :

(i) Kundu, A. (2012). Report of the Technical group on Urban Housing shortage 2007-'12. নতুনদিল্লি : ভারত সরকার।

(ii) আর্থ-সামাজিক এবং জাতিগত জনগণনা-২০১১, ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। পাওয়া যাবে http://sec.gov.in/reporttest Content-এ।

(iii) Deb, A. (2016). Viability of Public Private Partnership in Building Affordable Housing in India, HUDCO-HSMI, Vol. 17, No. 1, Shelter.

(iv) Right to Fair Compensation and Transperency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(v) PMAY প্রকল্প নির্দেশিকা, ভারত সরকার, মার্চ, ২০১৬।

(vi) PMAY প্রকল্প সংশোধনী, ভারত সরকার, June 27, 2017।

(vii) কর্ণাটক সুলভ আবাসন নীতি ২০১৬, আবাসন বিভাগ, কর্ণাটক সরকার।

সুলভ আবাসনের জন্য অর্থসংস্থান

চরণ সিং

ভারতে গৃহঋণের বাজারে যে দুর্বলতা রয়েছে তা দূর করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক্ষেত্রে উদারীকরণের রাস্তায় হাঁটা হচ্ছে। এই বাজারে এমন বেশ কিছু মহল সক্রিয় রয়েছে, যাদের ওপর সেভাবে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাদের কাজকর্মে নজরদারিও নেই সেভাবে। সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাড়ির দাম এবং গৃহঋণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঋণ-সম্পদ অনুপাত (LTV Ratio) এবং হঠাৎ করে হু হু করে বাড়ির দাম কমার মধ্যে সরাসরি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই খুব বেশি হস্তক্ষেপ হলে গোটা প্রক্রিয়ার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে আবার, কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বিপদ আছে। কাজেই, সুচিন্তিত পদক্ষেপ জরুরি। নজরদারির ক্ষেত্রে ঢিলেমি কাম্য নয়।

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে আবাসন ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্য ২৭০-টি শিল্পের সঙ্গে এর নিবিড় যোগ রয়েছে। আবাসন ক্ষেত্রের বিকাশ সরাসরি প্রভাব ফেলে কর্মসংস্থান, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদার ওপর। এজন্য আবাসন ক্ষেত্রকে জোরদার করে তুলতে দরকার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও বাজার গড়ে তোলা। অন্য দেশের তুলনায় ভারতে আবাসনের জন্য অর্থসংস্থানের বাজার এখনও তেমন একটা পরিণত নয়। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে আবাসনের জন্য অর্থসংস্থানের অবদান চিনে ১২ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২৯ শতাংশ, স্পেনে ৪৬ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ শতাংশ। তুলনায় ভারতে এই অনুপাত মাত্র ৮ শতাংশ।

আবাসন অর্থসংস্থানের বাজার নগরায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলা স্বাভাবিক। ভারতে নগরায়নের হার খুবই দ্রুত। ২০১১ সালে তা ছিল ৩১ শতাংশ। ২০৩০ সাল নাগাদ এই হার ৪১ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। সে সময় দেশের ৬০ কোটিরও বেশি মানুষ হবেন শহরবাসী। ২০১১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৩৬ কোটির মতো। কাজেই, আবাসনের জোগান এবং চাহিদার মধ্যে ফারাক ঘোচানো দেশের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। এজন্য অবশ্যই দরকার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান। স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল সুলভে আবাসন সংস্থান। বর্তমানে এক্ষেত্রে যে বাজার রয়েছে তা মূলত উচ্চবিত্তদের জন্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণি (EWS), কম আয়ের মানুষ (LIG) বা বস্তিবাসীরা আবাসনের অর্থসংস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

শহরাঞ্চলে জমির অপ্রতুলতা এবং আবাসনের চাহিদা ও জোগানের প্রেক্ষিত বিচার করলে দেখা যাবে, গৃহঋণের বাজার ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাত ধরে বেড়ে চলে আবাসনের চাহিদা। এর জোগানদার, অর্থাৎ প্রোমোটার এবং সরকারি ও বেসরকারি নির্মাণ সংস্থা ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরে এক্ষেত্রে সাহায্যকারীর ভূমিকায় রয়েছে সরকার। সরকার এই কাজ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা NHB-র মাধ্যমে। গৃহঋণের বাজারে দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক এবং গৃহঋণ দেওয়ার সংস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থা এবং অ-সরকারি সংগঠন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ওপরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও এক্ষেত্রে মূল নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার। গৃহঋণ সংস্থাগুলি রয়েছে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক-এর নিয়ন্ত্রণে।

[লেখক বেঙ্গালুরুর Indian Institute of Management-এ আছেন। গবেষণায় সহায়তা করেছেন অজয় পাই। ই-মেল : charansingh@iimb.ac.in]

ভারতে সুলভে আবাসনের জোগান

ভারতে, স্বাধীনতার পর পরই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত হয় সুলভ আবাসন নীতি। ১৯৫৭ সালে চালু হয় গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচি। ব্যক্তি বিশেষ এবং সমবায় সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়া ছিল এর লক্ষ্য। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে চালু হয় আবাসন স্থল তথা নির্মাণ সহায়তা প্রকল্প। ১৯৭৪ সালে এর দায়িত্ব যায় রাজ্য সরকারগুলির হাতে। ১৯৮০ এবং ১৯৮৩-তে চালু হওয়া গ্রামীণ ও ভূমিহীন কর্মসংস্থান প্রকল্পের উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৮৫ সালে সূচনা হয় ইন্দিরা আবাস যোজনার। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৫-র ২৫ জুন চালু হয়েছে "২০২২-এর মধ্যে সবার জন্য আবাস প্রকল্প" (HA-22)। এর লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে আরও ২ কোটি আবাসগৃহ নির্মাণ। গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য এই প্রকল্প চালু হয়েছে ২০১৬-র পয়লা এপ্রিল। এখানে ২০২২ নাগাদ তিন কোটি পাকা বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

সুলভে আবাসনের সংস্থানের লক্ষ্যে একটি বড়ো উদ্যোগ হল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)। এর আওতায় রয়েছে গ্রাম এবং শহরাঞ্চল। বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের নিজেদের জমিকে ব্যবহার করে বাসস্থান তৈরি করে দেওয়ার সংস্থান রয়েছে এখানে। এক্ষেত্রে সামিল করা হয় বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও। আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর গোষ্ঠী (EWS) এবং নিম্ন আয়ের মানুষজনের (LIG) জন্য এতে ঋণ সংযুক্ত ভরতুকির ব্যবস্থা আছে। PMAY রূপায়িত হয় স্থানীয় সংস্থা অথবা রাজ্য সরকারের অধীন সংস্থার মাধ্যমে। এজন্য অর্থ জোগায় কেন্দ্র।

ঋণের সুদে ভরতুকি প্রকল্প

PMAY (নগরাঞ্চল) HA-22 মিশনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর (EWS) এবং নিম্ন আয়ের (LIG) মানুষজনের স্বার্থে চালু করা হয়েছে ঋণের সুদে ভরতুকি প্রকল্প (CLSS)। মাঝারি আয়ের লোকজনও এর সুবিধা পেতে পারেন। CLSS-এর লক্ষ্য হল ভারতে বাড়ির চাহিদা বাড়ানো। ঘরবাড়ি নির্মাণ, পুরোনো বাড়িতে ঘরের সংখ্যা বাড়নো, রান্নাঘর, স্নানাগার তৈরি করতে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন মানুষজন। এই প্রকল্পে EWS এবং LIG-দের জন্য ঋণে সুদের ওপর ৬.৫ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হয়। MIG-তে যাদের উপার্জন বছরে ১২ লক্ষ টাকার কম তারা ঋণের সুদে ভরতুকি পান ১২ শতাংশ হারে (MIG1)। যাদের বছরে আয় ১২ থেকে ১৮ লক্ষ টাকার মধ্যে (MIG2) তারা এই ভরতুকি ৩ শতাংশ হারে পান। EWS/LIG-দের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যায় ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে। MIG1-এর ক্ষেত্রে এই ঊর্ধ্বসীমা ৯ লক্ষ টাকা, MIG2-এর ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকা।

মানুষকে বাড়ির মালিকানায় উৎসাহিত করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য। EWS/LIG, MIG—সব শ্রেণির মানুষই এর আওতায় থাকতে পারেন। EWS/LIG-র ক্ষেত্রে CLSS-এর সুবিধা দেওয়া হয় পরিবারের কর্ত্রী, অথবা যৌথভাবে কর্তা এবং তার স্ত্রীর নামে। কাজেই, মহিলাদের হাতে বাড়ির মালিকানা তুলে দিতে এখানে অগ্রাধিকার রয়েছে। MIG-তে সব সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বিধবা এবং কর্মরত একা মহিলাদের। EWS/LIG-তে CLSS-এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান সাফাইকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজন। বাসস্থান নির্মাণের আর্থিক দায়ভার কমানো এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে তার সুবিধা পৌঁছে দিতেই হাতে নেওয়া হয়েছে এই প্রকল্প।

প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সরাসরি বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব থেকে সরে আসছে সরকার। সরকার এখন মূলত ব্যবস্থাপকের ভূমিকা নিচ্ছে। সেই ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার সময় থেকেই দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে আবাসন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে তৈরি হয় জাতীয় ভবন সংস্থা বা National Buildings Organisation (NBO)। আবাসনের চাহিদা মেটাতে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম' বা Housing and Urban Development Corporation Ltd.'—HUDCO। গৃহঋণ সংস্থাগুলির বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮৮ সালে।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে করছাড়ের সুযোগ দেয়। ভাড়া দেওয়ার জন্য গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দিতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার পাট্টাদাতাদের স্বার্থরক্ষায় আইন প্রণয়ন করেছে। স্থাবর সম্পত্তি বা Real Estate ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্যও খুলে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ। পরিকাঠামো-সহ সংশ্লিষ্ট আরও নানা ক্ষেত্রেই বিদেশি বিনিয়োগ আসার পথ মসৃণ করে দেওয়া হয়েছে।

আবাসন ও গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রের প্রসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ গৃহঋণ বাবদ বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে। এই ঋণ পেতে পারেন ব্যক্তি বিশেষ এবং সমবায়-সহ বিভিন্ন সংগঠন। নির্বাচিত কয়েকটি আবাসন নির্মাণ সংস্থার বন্ড কিনেও এক্ষেত্রে টাকা ঢালতে পারে ব্যাঙ্কগুলি। ২০০৪ সাল থেকে বন্ধক বা মর্টগেজের ভিত্তিতে নিদর্শনপত্র বা সিকিউরিটির (MBS) মাধ্যমেও আবাসন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি বিনিয়োগ করতে পারছে। এই সব কারণে এবং সুদের হার সুবিধাজনক হওয়ায় বাড়ি তৈরির জন্য ঋণ নেওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে।

সকলের জন্য আবাসন কর্মসূচিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা। সুলভে আবাসন তৈরির উদ্যোগে এ দেশের সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় 'রাষ্ট্রসংঘের বিকাশ কর্মসূচি' বা UNDP। কম আয়ের মানুষ যাতে গৃহঋণ-এর সুবিধা পান, সেজন্য জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা NHB-র মাধ্যমে সহায়তা দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক।

অন্যান্য দেশের ছবি

বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য অনেকটাই দায়ি গৃহ নির্মাণ বা আবাসন ক্ষেত্রে হঠাৎ চাহিদা হ্রাস। কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে গৃহ নির্মাণ ও আবাসন ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। রিয়েল এস্টেট-এর বাড়বাড়ন্ত, আবার হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া, দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটেনের

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে যে, আবাসন ক্ষেত্রের অতিরিক্ত বাড়বাড়ন্তের পর হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় উৎপাদন মার খেয়েছে। সমস্যা তৈরি হয়েছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে। উন্নত দেশের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশেও তাই হওয়ার সম্ভাবনা। নির্মাণক্ষেত্রের বাড়াবাড়ি রকম ফুলে-ফেঁপে ওঠার পর হঠাৎ বাজার খারাপ হলে মন্দা ডেকে আনতে পারে।

উন্নত দেশগুলিতে গৃহঋণ-এর বাজার ২০০ বছরেরও পুরোনো। ডেনমার্কে বন্ধক রেখে গৃহঋণ দেওয়ার রীতি চালু হয় ১৭৯৫ সাল নাগাদ। জার্মানিতে এ ধরনের ব্যবস্থাপনার সূচনা ১৭৬৯ সালে। অন্য দিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা হালে গড়ে উঠছে। উন্নত অর্থনীতিতে কভার্ড বন্ড, বন্ধকের বদলে নিদর্শনপত্র বা সিকিওরিটি-র মাধ্যমে গৃহঋণের ব্যবস্থা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের ওপর সুদের হার পরিবর্তনীয়। নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ শোধ দিলে জরিমানা দিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বেশিরভাগ উন্নত দেশেই LIG-ভুক্তদের সুলভে আবাসনের সংস্থানের জন্য সরকার আইনানুগভাবে দায়বদ্ধ। তবে ইউরোপে, একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যকর। সেখানে গৃহঋণ-এর জন্য চুক্তিভিত্তিক সঞ্চয়ে সামিল হলে তার ওপর ভরতুকি মেলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গৃহঋণ দেয় মূলত ব্যাঙ্ক। চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রাশিয়া ছাড়া বন্ডের ব্যবস্থা সেভাবে কোথাও নেই। চিলি, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো ছাড়া মর্টগেজের বদলে সিকিওরিটি ইস্যু করার রেওয়াজও কোথাও নেই সেভাবে। এই সব দেশে ঋণ-সম্পদ অনুপাত বা LTV ৬০ থেকে ১১০ শতাংশ। সুদের হার পরিবর্তনীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার ভরতুকি, করছাড়-এর ব্যবস্থা করে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নির্ধারিত সময়ের আগে তোলার সংস্থানও আছে।

উন্নত এবং উন্নয়নশীল—দু' ধরনের দেশেই নাগরিকদের নিজেদের বাড়ির মালিক করে তুলতে নিয়মিতভাবে পদক্ষেপ নেয় সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানিতে গৃহঋণের সুদে ভরতুকি পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ায় সরকার মর্টগেজের বদলে গৃহঋণ দেয়। ব্রাজিল, চিন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের মতো দেশে বন্ধকের বদলে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

সুলভে আবাসনের জন্য নানান দেশে নানান ধরনের প্রকল্প এবং নীতি রয়েছে। ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, সুইডেনের মতো দেশে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুলভে আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা হয়। অন্যদিকে, মালয়েশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র কম উপার্জনকারীদের জন্যেই এ সংক্রান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাপনা সাধারণ গৃহঋণ ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা। এর নানা কারণ রয়েছে। মার্কিন মুলুকে সুলভে আবাসনের সংস্থানের দায়িত্ব ন্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ওপর। কানাডায় এই দায়ভার মূলত স্থানীয় প্রশাসনের। আমেরিকায় স্বল্প দামের আবাসন নির্মাণে নির্মাতাদের উৎসাহিত করতে বোনাস, পারমিটের ক্ষেত্রে ছাড়, প্রকল্পের আবেদন মঞ্জুরের কাজ দ্রুতগতিতে করা—এই সব সুবিধা দেওয়া হয়। কানাডায় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকারকে প্রদেয় অর্থে ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। নেদারল্যান্ডসে এ জন্য বিশেষ তহবিল রয়েছে—যা গ্যারান্টি হিসেবে কাজ করে। স্পেনে সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সময় ভরতুকি মেলে। সিঙ্গাপুরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চালু রয়েছে বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প। বাংলাদেশে পুনর্বাসন শিবির প্রকল্পের দায়ভার সরকারের। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় গৃহঋণের জন্য সেখানে গৃহঋণ প্রদানের জন্য রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা। মেক্সিকো-তে সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মীদের বেতনের নির্দিষ্ট অংশ সরিয়ে রাখা হয়।

শেষ কথা

ভারতে গৃহঋণের বাজারে যে দুর্বলতা রয়েছে তা দূর করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক্ষেত্রে উদারীকরণের রাস্তায় হাঁটা হচ্ছে। এই বাজারে এমন বেশ কিছু মহল সক্রিয় রয়েছে, যাদের ওপর সেভাবে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাদের কাজকর্মে নজরদারিও নেই সেভাবে। সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাড়ির দাম এবং গৃহঋণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঋণ-সম্পদ অনুপাত (LTV Ratio) এবং হঠাৎ করে হু হু করে বাড়ির দাম কমার মধ্যে সরাসরি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই খুব বেশি হস্তক্ষেপ হলে গোটা প্রক্রিয়ার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে আবার, কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বিপদ আছে। কাজেই, সুচিন্তিত পদক্ষেপ জরুরি। নজরদারির ক্ষেত্রে ঢিলেমি কাম্য নয়।

বহু মানুষ জীবনের গোটা সঞ্চয়টুকু দিয়ে বাড়ি-ঘর কেনেন। সুতরাং সরকারের এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন থাকা দরকার। কোনও নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি না থাকলে গোটা প্রক্রিয়াতে অস্বচ্ছতা চলে আসতে বাধ্য। অন্যান্য বাজারের মতো এখানেও উপভোক্তারা সঠিক গুণমানের পণ্য পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। আবাসন, সাধারণভাবে রাজ্যের বিষয়। কাজেই এক্ষেত্রে রাজ্য স্তরে ঠিকঠাক আইন থাকা এবং তার সুচিন্তিত প্রয়োগ জরুরি।

ভবিষ্যতের দিকে তাকানোও একান্ত প্রয়োজন। PMAY-র আওতায় আগামী ৫ বছরে ৫ কোটি বাড়ি তৈরির কথা বলা হচ্ছে। CLASS প্রকল্প EWS/LIG/MIG-ভুক্তদের মধ্যে বাড়ির চাহিদা বাড়াবে—তা আশা করাই যায়। সেজন্য আর্থিক সংস্থানের পরিকল্পনা নিতে হবে জরুরিভিত্তিতে। দেখতে হবে গৃহঋণের উৎস হিসেবে ব্যাঙ্কগুলির জায়গায় অন্যান্য সংস্থা উঠে আসে কিনা। যদি তা হয়, তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম সংস্থা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সুনিশ্চিত করতে হবে পর্যাপ্ত কাঁচামাল, অর্থাৎ সিমেন্ট, ইস্পাত, লোহা, বালি, কাঠ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জোগান। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো যেসব রাজ্যে বাড়ির চাহিদার তুলনায় জোগান কম, সেই সব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করাও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।

আবাসন ক্ষেত্র জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। তাই এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত HUDCO, NHB, NBO-র মতো সংস্থাগুলির আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা দরকার। আবাসন ক্ষেত্রের উন্নয়নে এই সব প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক উদ্যোগ জরুরি। পাশাপাশি, কেন্দ্রে এবং রাজ্য সরকারগুলির সুচিন্তিত পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবাসন ক্ষেত্রের বিকাশ দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করবে। উলটোটা হলে দেখা দেবে মন্দা এবং বেকারি।❑

লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকাতেও সবার মাথায় এক চিলতে ছাদ

সমীরা সৌরভ, রাহুল সিং

২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০ জন মানুষ, অর্থাৎ, জনসংখ্যার শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ গৃহহীন। এদের মধ্যে ৫২ দশমিক ৯ শতাংশ বাস করেন শহর এলাকায় আর ৪৭ দশমিক ১ শতাংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। গ্রামীণ এলাকায় বি পি এল পরিবারগুলির মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে এক স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসাবে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' চালানো হচ্ছে। ঘাটতি কিছু কমানো গেলেও লক্ষ্য পূরণ দূর অস্ত্। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ২০২২ সালের মধ্যে গ্রামেও সবার মাথার উপর এক চিলতে ছাদের বন্দোবস্ত করা।

গৃহহীনতা সমস্যাটি বেড়েই চলেছে এবং তা গোটা বিশ্ব জুড়েই। চালচুলো না থাকাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ায়। এসব জায়গায় জনবৃদ্ধির হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। খাদ্য ও পোশাক-আশাকের পর মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। গৃহহীনতা হল আবাসনের জন্য খরচ কুলানোর সংগতি না থাকা বা পাকাপাকি ও নিরাপদ আস্তানা জোটাতে অপারগতা।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ঠাটবাট বাড়লেও, এদেশে ১০ লক্ষের বেশি মানুষের কোনও ঘরবাড়ি নেই। ২০১১-র জনগণনা অনুসারে ভারতে ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০, অর্থাৎ ০.১৫ শতাংশ লোক গৃহহীন—শহর এলাকায় ৫২.৯ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৭.১ শতাংশ। সংজ্ঞা মোতাবেক, গৃহহীন বলতে বোঝায় মাথার উপর কোনও ছাদ বা চাল নেই।

৫ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে বেড়ে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার হলেও, দেশে বাড়ির ঘাটতি ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার (২০১১ আদমসুমারির হিসেব)। ভারতের সামনে এখন অন্যতম মস্ত চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করা। গরিবি কমাতে অভাবিদের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শহুরে এলাকায় গৃহহীনতা ও বস্তি-ঝুপড়ির সমস্যার মূল কারণ গাঁয়েগঞ্জে রুজিরুটি রোজগারের তেমন সুযোগ কই! গরিবি রেখার নিচের (বিপিএল) মানুষের বেশিরভাগ থাকে গ্রামাঞ্চলে এবং সেখানে ঘরবাড়ি না থাকার সমস্যা আরও তীব্র।

দেশে সরকারি আবাসন কর্মসূচির শুরু স্বাধীনতার পরপরই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য। ১৯৬০ ইস্তক, ভারতের বিভিন্ন অংশে বাড়ি দেওয়া হয় লাখ পাঁচেক পরিবারকে।

বিপিএল পরিবারের ঘরবাড়ির চাহিদা মেটানোর লক্ষে ইন্দিরা আবাস যোজনা এক স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিণত হয় ১৯৯৬-র পয়লা জানুয়ারি থেকে। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে চলার পর, এই যোজনা গ্রামাঞ্চলে বাড়ির ঘাটতি অনেকখানি কমাতে পারলেও, এখনও সেখানে মাথার উপর এক চিলতে ছাদ নেই অনেকের। ভারত সরকার তাই ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য বাড়ির সংস্থানে অঙ্গীকার করেছে। ইন্দিরা আবাস যোজনাকে ২০১৬-র পয়লা এপ্রিল থেকে পুনর্গঠন করা হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' গ্রামীণ-এ। আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি ও নিম্ন আয় গোষ্ঠী ছাড়াও, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মাঝারি আয়ের লোকজনের চাহিদা মেটাতে তার পরিসর বাড়িয়েছে। "২০২২-র মধ্যে সবার জন্য আবাস" সরকারের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচির লক্ষ্য শহরে ২ কোটি এবং গ্রামাঞ্চলে ৩ কোটি বাড়ি বানানো। নিষ্কাশন পরিষেবা-সহ আরও উন্নতমানের বাড়ির জন্য "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা

[সমীরা সৌরভ ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের নির্দেশক। ই-মেল : sameera.saurabh@gmail.com; শ্রী সিং বাণিজ্যিক উপদেষ্টা ও বিশ্লেষক। ই-মেল : singh.rahul8@gmail.com]

প্রকল্প” এবং স্যানিটেশন প্রকল্পের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা জুড়ে নেওয়া যেতে পারে। এই যোজনায় গ্রামাঞ্চলে ফি বছর তৈরি হবে লাখ চল্লিশেক বাড়ি।

২০১৬-’১৭ থেকে ২০১৮-’১৯ সময়কালের জন্য সরকার ১ কোটি বাড়ি তৈরির প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। এজন্য খরচ পড়বে ৮১,৯৭৫ কোটি টাকা। ২০২২ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর “সবার জন্য আবাস” কর্মসূচির লক্ষ্যে এ এক সঠিক পদক্ষেপ। ২০১১-র আর্থ-সামাজিক জাতি জনগণনার আপাত হিসেব মোতাবেক গ্রামে বাড়িঘরের সমস্যায় জেরবার প্রায় কোটি চারেক পরিবার।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর প্রথম পর্যায়ে, ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সময় পর্ব পর্যন্ত ১ কোটি বাড়ি তৈরির লক্ষ্য আছে।

পরের ধাপে, ২০১২ পর্যন্ত, কত বাড়ি করতে হবে তা ঠিক হবে চূড়ান্ত সব তথ্য মেলার পর। বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য পূরণের জন্য কারিগরি সহায়তা জোগাতে জাতীয় স্তরে গড়ে তোলা হবে জাতীয় কারিগরি সহায়তা সংস্থা—ন্যাশনাল টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি। বাজেট এবং নাবার্ড থেকে ঋণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত টাকাকড়ির সংস্থান করা হয়েছে। দেরিতে টাকাপয়সা মেলার সমস্যা ঘোচানো এবং বাড়ি তৈরি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে সরাসরি উপকার হস্তান্তর (ডিবিটি) কর্মসূচির আওতায় বৈদ্যুতিন হস্তান্তর এই যোজনার আর এক বৈশিষ্ট্য।

এমআইএস—আবাসসফ্ট প্রকল্প মারফত বিশদ অনলাইন তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে। আবাসঅ্যাপ মোবাইল অ্যাপটি বাড়ির ইন্সপেকশন ও জিও-ট্যাগিং-এর সাহায্যে বাড়ি তৈরিতে দেরি কমাতে সাহায্য করবে। গ্রামে রাজমিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নেওয়া হবে এক কর্মসূচি।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ সমতল অঞ্চলে বাড়ি পিছু ১.২০ লক্ষ এবং পাহাড়ি রাজ্য, অসুবিধেজনক এলাকা ও বাছাই করা উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া সংহত অ্যাকশন প্ল্যান (আইএপি) জেলায় ১.৩০ লক্ষ টাকা দেয়। এই হেরফেরের কারণ হল এসব জায়গায় নির্মাণ সামগ্রী মেলা ভার, অনুন্নত

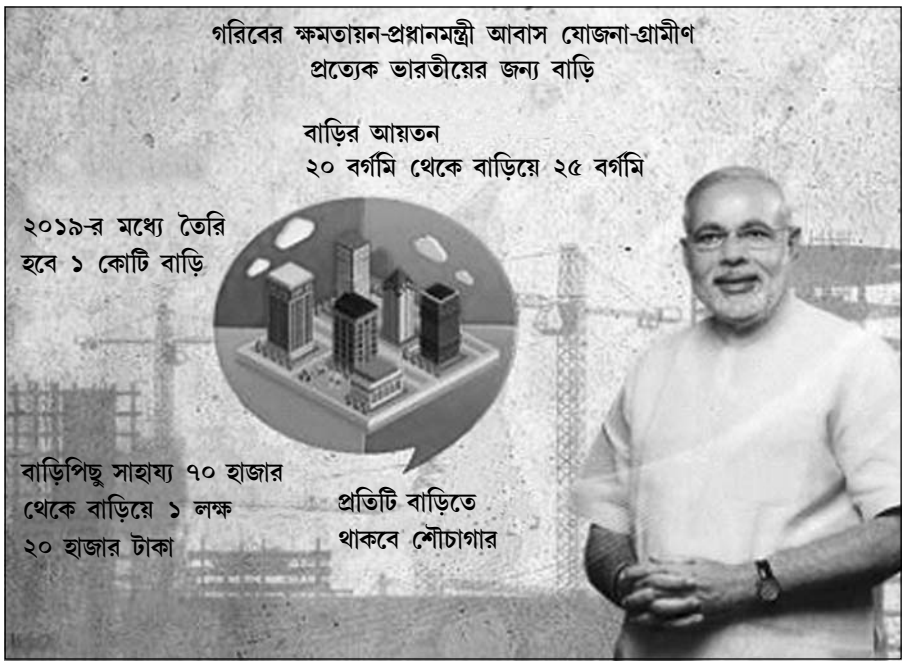

যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিকূল জলবায়ু। ফলে বাড়ি তৈরির খরচপাতি বেশি। কোনও জায়গা অসুবিধেজনক কিনা, তা ঠিক করার দায়িত্ব থাকবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। হাতের কাছে পাওয়া মালমশলা দিয়ে খাসা বাড়ি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বানানো নিশ্চিত করার জন্য, উপকৃতদের টাকা দেওয়া ছাড়াও, বাড়ি তৈরির বিভিন্ন ধাপে ইমারতি দ্রব্যের প্রয়োজন, স্থানোপযুক্ত বাড়ির নকশা বাছাই, খরচসাশ্রয়ী নির্মাণ প্রযুক্তির বিষয়ে সচেতনতা, বাড়ি তৈরির মালপত্র জোগাড়, প্রশিক্ষিত বা তালিমপ্রাপ্ত রাজমিস্ত্রি জোগাড় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহায়তামূলক পরিষেবা উপকৃতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক।

সহায়তামূলক পরিষেবা জোগানোর জন্য নিচের ক্ষেত্রগুলিতে কাজে নেমে পড়া দরকার :

ক) উপকৃতদের সচেতন করে তোলা;

খ) বাড়ির নকশার টাইপ বা ধরন উদ্ভাবন ও তা উপকৃতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া;

গ) রাজমিস্ত্রিদের তালিম ও দক্ষতার শংসা বা সার্টিফিকেশন;

ঘ) ইমারতি দ্রব্যের উৎসের সুলুকসন্ধান;

ঙ) বৃদ্ধ ও অক্ষম উপকৃতদের জন্য সহায়তা;

চ) ব্যাঙ্ক থেকে ৭০ হাজার টাকা অবধি ঋণ পেতে সহায়তা।

বাড়ির নকশা

এলাকার সঙ্গে মানানসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী বাড়ির এক গুচ্ছ নকশা উপকৃতদের সামনে রাজ্যগুলি হাজির করবে।

প্রতিটি নকশায় অবশ্যই স্বাস্থ্যকর রান্নার জায়গা, শৌচাগার ও স্নানাগার থাকা উচিত। স্থানীয় জলবায়ুর সঙ্গে যুঝতে ছাদ ও দেওয়াল শক্তপোক্ত হওয়া চাই। ভূকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যার ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা থাকা দরকার। বাড়ির নকশায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকাও বাঞ্ছনীয় :

ক) টুকিটাকি রোজগারের জন্য কাজ করার জায়গা;

খ) বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা;

গ) বারান্দা;

কিছু পুঁজিপাটা হলে, উপকৃতরা যেন পরে এসব করে নিতে পারে।

২০১৮-১৯ সালের মধ্যে ১ কোটি বাড়ি বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ খরচ পড়বে ১,৩০,০৭৫ কোটি টাকা। কেন্দ্র দেবে এর ৬০ শতাংশ। রাজ্য ৪০ শতাংশ। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও হিমালয় লাগোয়া তিন রাজ্য, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে খরচের ৯০ শতাংশই জোগাবে কেন্দ্রীয় সরকার। এসব রাজ্যের

দায়িত্ব মাত্র ১০ শতাংশ। আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রই ভার নেবে পুরো খরচের।

কর্মসূচিতে কেন্দ্রের খরচ হবে ৮১,৯৭৫ কোটি টাকা। এবাবদ বাজেট থেকে মিলবে ৬০,০০০ কোটি টাকা। ২১,৯৭৫ কোটি টাকা ধার নেবে নাবার্ড থেকে। ২০২২ সালের পর বাজেট অনুদানের মাধ্যমে শোধ করা হবে এই ঋণ।

গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা জেলাকে একটি ইউনিট বা একক হিসেবে ব্যবহার করে রাজ্যগুলি স্যাচিয়ুরেশান অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করতে পারে। অগ্রাধিকার দেওয়া হবে খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করা গ্রাম পঞ্চায়েত, সংসদ আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর মাধ্যমে মজবুত সামাজিক মূলধন গড়ে তোলা গ্রাম পঞ্চায়েতকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইন, ১৯৯৫-এ প্রতিবন্ধীদের জন্য আছে সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান। তদানুসারে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ বাড়ি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে প্রতিবন্ধী সদস্য থাকা এবং কোনও সুস্থসবল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিহীন পরিবারকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইন, ১৯৯৫-এর বিধি মেনে রাজ্যগুলি উপকৃতদের মধ্যে ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী থাকাটা সুনিশ্চিত করতে পারে।

বছরে ১০০ দিন কাজের সুযোগ দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পে। এই প্রকল্পের কার্ড গ্রহীতাদের এই ১০০ দিন ছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর আওতায় বাড়ি তৈরির জন্য বাড়তি দিন কাজে লাগাতে সরকার আবাস যোজনার উপকৃতদের অনুমতি দিয়েছে। এর দরুন বাড়ি তৈরি জলদি সারা যাবে এবং গ্রামে আকালের সময় জব কার্ড গ্রহীতাদের জুটবে কিছু বাড়তি আয়।

এছাড়া, সম্ভব হলে এই যোজনায় জাতীয় স্তরে মোট তহবিলের ১৫ শতাংশ বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকবে সংখ্যালঘুদের জন্য। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে গ্রামীণ জনসংখ্যায় সংখ্যালঘুদের অনুপাতের ভিত্তিতে তাদের জন্য বরাদ্দের লক্ষ্য ঠিক করা হবে।

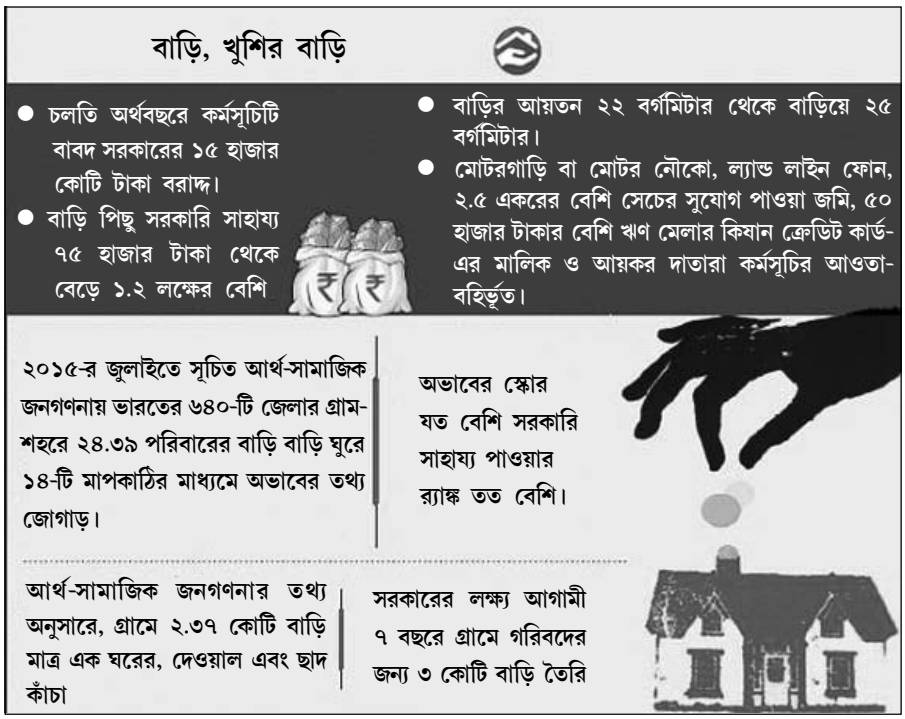

সহায়তা ব্যবস্থাদির রূপায়ণ

● **গ্রামীণ আবাসনের জন্য জাতীয় কারিগরি সহায়তা সংস্থা :** সবার জন্য বাড়ির লক্ষ্য পূরণে কারিগরি সহায়তা জোগাতে, জাতীয় স্তরে গড়া হচ্ছে গ্রামীণ আবাসনের জন্য জাতীয় কারিগরি সহায়তা সংস্থা (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি ফর রুরাল হাউজিং)। সংস্থার কাজ হবে উন্নত মানের নির্মাণ সুনিশ্চিত করা; রূপায়ণে নজর রাখা; বাজেট বহির্ভূত অর্থের ব্যবস্থাপনা; তথ্য, শিল্প ও যোগাযোগ, ই-প্রশাসন পদ্ধতি বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের চিহ্নিত করা কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রগুলির কাজকর্মে সমন্বয়ে সাহায্য করা।

● **মিলমিশ :** মৌলিক স্বাচ্ছন্দ্য জোগাতে, বাড়ি তৈরির জন্য সাহায্য করা ছাড়াও, কেন্দ্র এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির একাভিমুখী সুনিশ্চিত করা দরকার। মৌলিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্য যেসব প্রকল্পের মধ্যে তালমিল আনা জরুরি তার মধ্যে পড়ে :

ক) শৌচাগার তৈরি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর অন্যতম অঙ্গ করা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প বা অন্য কোনও উৎস থেকে এজন্য উপকৃতদের টাকা দেওয়া হবে। বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেও, শৌচাগারের ব্যবস্থা না করা অবধি বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে না।

খ) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বাড়ি তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ কর্মসূচির উপকৃতদের চলতি মজুরি হারে ৯০ ব্যক্তিদিবস অদক্ষ মজুরি কর্মসংস্থানে সহায়তা করা বাধ্যতামূলক। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর আবাসসফ্ট এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের এনরেগাসফ্ট-এ দুই ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এসআইএস)-এর মধ্যে সার্ভার থেকে সার্ভার সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। আবাসসফ্টে বাড়ি তৈরির মঞ্জুরি ইসু হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনরেগাসফ্টে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরুর সংকেত ফুটে উঠবে।

গ) পানীয় জল জীবনের জন্য অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচি বা অনুরূপ কোনও প্রকল্পের সঙ্গে মিল রেখে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর উপকৃতের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল জোগানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

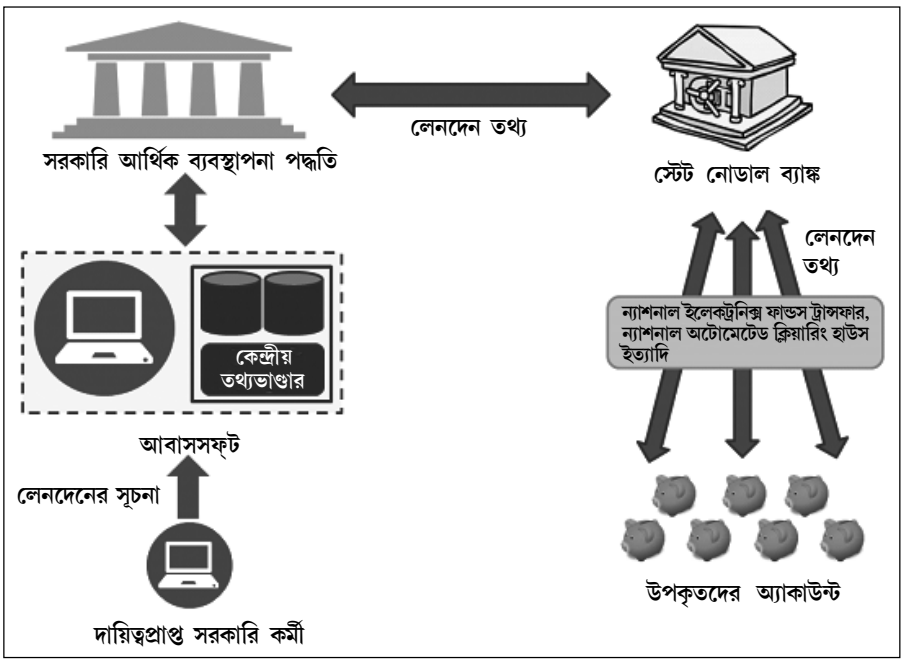

ঘ) শক্তি মন্ত্রকের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় সামিল হয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর উপকৃতের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা দরকার। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেখতে হবে এই উপকৃতরা যেন নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের মন্ত্রকের প্রকল্পগুলির নাগাল পায়। এসব প্রকল্পের মধ্যে আছে সৌর লণ্ঠন, ঘরে সৌর আলোর ব্যবস্থা, রাস্তায় সৌর আলো, রান্নার পরিচ্ছন্ন বা ছিমছাম জ্বালানির জন্য বায়ো-মাস স্টোভ এবং বায়োগ্যাস।

ঙ) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর উপকৃতদের পরিচ্ছন্ন এবং আরও কার্যকর জ্বালানি সরবরাহের জন্য রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উচিত পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার এলপিজি গ্যাসের ব্যবস্থা করা।

চ) ঘরবাড়ির পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে, বাড়ির কঠিন ও তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা দরকার। এজন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্য কোনও প্রকল্পের সঙ্গে সংযোগ মারফত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কাজ করতে পারে।

ছ) ইমারতি দ্রব্যের প্রয়োজন মেটাতে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ-কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচির সঙ্গে মিলেমিশে, তাপবিদ্যুৎ কারখানার ছাই থেকে ইটের মতো বাড়ি তৈরির মালমশলা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার।

জ) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচির সঙ্গে তালমিল রেখে, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাড়ি তৈরির জায়গা উন্নয়ন, পাকা রাস্তা, মাটি সংরক্ষণের মতো গোষ্ঠী/ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের দিকে নজর দিতে পারে।

আর্থ-সামাজিক জনগণনা, ২০১১ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর উপকৃতদের বাছাই করা হয় এবং আরও অনেক কর্মসূচিতে একই তথ্য ব্যবহার করা হয় বলে উপকারের সমন্বয় আনাটা অনেকটা সহজ হবে।

রূপায়ণ ও নজরদারি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ কর্মসূচি রূপায়ণ ও নজরদারির কাজ আদ্যোপান্ত চলবে ই-শাসন মডেলে। প্রকল্পটিতে ই-শাসন ভিত্তিক পরিষেবা জোগানোর জন্য দু'টি ব্যবস্থা আছে :

ক) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম আবাসসফ্ট (The PMAY-G MIS-Awaassoft)।

খ) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন-আবাসঅ্যাপ (The PMAY-G mobile application-AwaasApp)।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এ পদ্ধতি ও পারফরম্যান্স বা কাজকর্ম উভয় দিক দেখভালের জন্য এক কড়া নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আবাসসফটে ওয়ার্কফ্লো এনেবলড ট্র্যানজ্যাকশনাল ডেটা ব্যবহার করে কাজে অগ্রগতির রিয়্যাল টাইম ক্যাপচারের মাধ্যমে পারফরম্যান্সে নজর রাখা হয়। কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শন, সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও নজরদারি কমিটির তত্ত্বাবধান-এর মতো পদ্ধতিগত নজরদারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামাজিক অডিট ও রাজ্য স্তরে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট আছে।

আবাসসফ্ট রিয়্যাল টাইম ট্র্যানজেকশানাল ডেটা ভিত্তিক বিভিন্ন মাপকাঠির উপর বহু রিপোর্ট তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ যাবতীয় রিপোর্ট হয় আবাসসফ্ট রিপোর্ট মারফত। এই কর্মসূচিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অগ্রগতিতে নজর রাখা হয় কেবলমাত্র আবাসসফ্টের রিপোর্টের মাধ্যমে।

আবাসসফ্ট

আবাসসফট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ ই-প্রশাসনে সহায়তা করতে ওয়েব ভিত্তিক বৈদ্যুতিন পরিষেবা জোগানোর এক প্ল্যাটফর্ম।

সবার জন্য বাড়ির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা ব্যবস্থা

আবাসন ক্ষেত্রে টেঁকসই বিকাশে সহায়তা করার জন্য জমি পাওয়া, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও পরিষেবা-সহ ঠিক সময়ে সেই জমির উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক সুষ্ঠু জমি নীতি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ বিশেষ জরুরি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গ্রামীণ ও শহর দুই অঙ্গেরই লক্ষ্য উপকৃতকে নিজ মালিকানার বাড়ি দেওয়া। এজন্য পর্যাপ্ত জমির বন্দোবস্ত করে ওঠাটা এক মস্ত সমস্যা। নতুন নতুন ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করে নির্মাণ ব্যয় কমানো, খরচসাশ্রয়ী নির্মাণ কলাকৌশল চালু

করা, নির্মাণ ও উৎপাদন পদ্ধতিতে জুতসই প্রযুক্তি এবং ইমারতি দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় মালমশলা কাজে লাগানো চাই। বাড়ি পছন্দের ক্ষেত্রে উপায়ান্তর না থাকা ও সেইসঙ্গে সীমিত আয় এবং কম রোজগারের মানুষজনের গৃহঋণ পাওয়ার তেমন একটা সুযোগ না থাকার দরুন লক্ষ লক্ষ পরিবার স্যানিটেশন, পরিস্রুত জল, বিদ্যুতের মতো মৌলিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

শেষভাগ

স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ভারতে তৈরি কর, তথ্য প্রযুক্তি/সরাসরি টাকা হস্তান্তর (ডিবিটি), আধার ও প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনাকে একঠাঁই করতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ এক মস্ত বড়ো পদক্ষেপ। কর্মসূচিটি ২০১৯ সালের মধ্যে দক্ষতা বাড়ানোর তালিম দেবে ৫ লক্ষ গ্রামীণ রাজমিস্ত্রিকে।

এই কর্মসূচিতে পরিবেশগত বিপত্তি ও পরিবারের প্রয়োজনের দিক বিশদ খতিয়ে দেখে সারা দেশে বাড়ির ২০০-র বেশি নকশার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাড়ি তৈরিতে স্থানীয় দ্রব্য ব্যবহার গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মিলমিশের মাধ্যমে ভাবা হয়েছে রান্নাবান্নার জায়গা, বিদ্যুৎ, এলপিজি, শৌচাগার, স্নানাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা-সহ পরিপূর্ণ বাড়ির কথা। কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে গরিব পরিবারগুলি। উপকৃতদের সঠিকভাবে বাছাই ও কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে এই কর্মসূচি তথ্য-যোগাযোগ এবং মহাকাশ প্রযুক্তি কাজে লাগায়।

নির্মাণ ক্ষেত্র ভারতে কর্মসংস্থানে দ্বিতীয়। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত আছে ২৫০-র বেশি অনুসারি শিল্প। গ্রামীণ আবাসনের উন্নয়ন গ্রামের মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করে। ইমারতি দ্রব্য কেনা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, পরিবহন পরিষেবা এবং ফলত টাকাকড়ি ... গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক ইতিবাচক ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে এবং চাহিদা বাড়ায়। এটা ঘটে দুই পর্যায়ে : নির্মাণ কালে এবং বাড়িতে ভোগদখল বা বসবাস করার সময়। বাড়ির হাল ফেরার পরোক্ষ ফল হল শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি। পুষ্টি, স্যানিটেশন, মা-শিশুর স্বাস্থ্যের মতো মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে এর সদর্থক প্রভাব পড়ে। ভৌত পরিবেশের উন্নতির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাড়ি হচ্ছে এক অর্থনৈতিক সম্পদ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় মঙ্গলকর প্রভাব ফেলে তা সমাজকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। পাকাপোক্ত বাড়ি থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার বহুবিধ এবং পরিবার ও স্থানীয় অর্থনীতি দুয়ের পক্ষেই মূল্যবান। ❑

WBCS সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সেরা বই

প্রকাশিত হল

কার্তিক চন্দ্র মন্ডল সম্পাদিত

জেনারেল স্টাডিজ - 2018 ₹ 950

বইটির বিষয়বস্তু — ● বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ● বর্তমান ভারত ● পশ্চিমবঙ্গ ● পৃথিবী ● বিবিধ ● সাহিত্য সংস্কৃতি ● চলচ্চিত্র ● ভারতীয় রাজনীতি ● আন্তর্জাতিক সংস্থা ● ভারতীয় অর্থনীতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ● পরিবেশ ● জীববিজ্ঞান ● রসায়ন ● পদার্থবিদ্যা ● কম্পিউটার ● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ● ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ● সাধারণ ভূগোল ● ভারতের ভূগোল ● পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ● খেলাধূলা ● পুরস্কার ● ইংরেজি ● গণিত ও জি. আই ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং 5 Free Practice Sets

● ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম - ₹ 495
Free 5 Practice Sets

● কমপিটিটিভ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড জেনারেল ইনটেলিজেন্স - ₹ 495
Free 10 Online Practice Sets

● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2018 অ্যান্ড জিকে ₹ 70

WBCS কোচিং 2018

কার্তিক চন্দ্র মন্ডল WBCS 2018-র

● Prelim এবং Mains সহ Geography 125 নম্বরের কোচিং শীঘ্রই শুরু করছেন

এবং

● WBCS Main এর Optional Geography পড়াচ্ছেন

এছাড়া

● History, Indian Economy, Indian Polity, Math & GI, English এর জন্য আলাদা করে ভর্তি চলছে।

মন্ডল প্রকাশনী
21, রামনাথ বিশ্বাস লেন
শিয়ালদহ, কলকাতা - 700 009
মোবাইল ঃ 98362 23112
ইমেল : mondalprakashoni@gmail.com

স্মার্ট সিটিতে গরিবের মাথা গোঁজার ঠাঁই

উষা পি. রঘুপতি

স্মার্ট সিটিগুলির উচিত গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরিতে উদ্ভাবনী ভাবনার ব্যবহার করা। গরিবদের জীবিকা উপার্জনকে নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা তখনই সম্ভব যখন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করার বিষয়টি কেবলমাত্র লক্ষ্যপূরণ কার্যসূচি হয়ে উঠবে না। যতক্ষণ না আমরা স্মার্ট সিটির শেষ লোকটিকে পর্যন্ত উন্নততর মানের জীবনযাত্রা উপহার দিতে পারব ততক্ষণ স্মার্ট সিটি একটি অভিজাত ধারণা হয়েই থেকে যাবে, যে ধারণা কেবল 'আরও ভালো'র কথা বলে, অন্য কিছু নয়।

উন্নত দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারত যে দৌড় শুরু করেছে, সেই দৌড়ের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে শহরাঞ্চলগুলির জন্য চালু করা 'স্মার্ট সিটি মিশন' নামক প্রকল্পটির সৌজন্যে। আরও দু'টি প্রকল্প, 'অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন' (AMRUT) এবং 'হাউসিং ফর অল', ভারতীয় শহরগুলির আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার, যেমন উন্নত পরিষেবা, উন্নত প্রশাসন ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার মতো সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য চালু করা হয়েছিল।

২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, ওই বছরের হিসাবে ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল ৩৭.৭০ কোটি। আর অন্য একটি আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী, আগামী দু'দশকে অঙ্কটি গিয়ে পৌঁছাবে ৬০ কোটিতে। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্যানুযায়ী, শহরগুলিতে বস্তিবাসীর সংখ্যা ১.৩৭ কোটি (১৭.৪ শতাংশ)। ২০১২ সালের এক টেকনিক্যাল গ্রুপ (দ্য টেকনিক্যাল গ্রুপ অন আরবান হাউসিং শর্টেজ, ২০১২-১৭ গঠন করেছিল ভারত সরকারের 'আবাসন ও শহরাঞ্চল দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক')-এর হিসেব অনুযায়ী, শহরাঞ্চলগুলিতে এখনও মোট ১.৮৮ কোটি বাড়ির প্রয়োজন, যার মধ্যে ৯৬ শতাংশ আর্থনীতিকভাবে দুর্বল (৫৬ শতাংশ) ও নিম্ন আয় (৪০ শতাংশ) শ্রেণির জন্য। আর এই শ্রেণিই 'সবার জন্য আবাস' প্রকল্পের উদ্দিষ্ট সম্প্রদায়। গ্রাম থেকে যারা শহরে আসে, তাদের অধিকাংশই উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারে না। ফলে তাদের ঠাঁই হয় কোনও বস্তিতে অথবা এমন কোনও জায়গা যেখানে বেঁচে থাকার প্রাথমিক উপকরণগুলির পর্যাপ্ত অভাব আছে। কথা হচ্ছে, স্মার্ট সিটির পরিকল্পনা করার সময় কি আমরা এইসব সমস্যাগুলির কথা ঠিকঠাক মাথায় রাখছি?

স্মার্ট সিটি প্রকল্পের গাইড-লাইন অনুযায়ী, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যে সমস্ত শহর মূল পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত করতে পারবে এবং যে শহর তার নাগরিকদের একটি স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে পারে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্মার্ট সলিউশনের মাধ্যমে নির্মল ও সুস্থায়ী করে তোলা। স্মার্ট শহরের লক্ষ্য হবে 'সর্বব্যাপ্ত ও সুস্থায়ী উন্নয়ন' লক্ষ্য হবে উন্নয়নের এমন মডেল গড়ে তোলা যা অনুকরণযোগ্য এবং অন্য শহরগুলি যাকে অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

স্মার্ট সিটির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার দু'টি ভাগ। একটি এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং অন্যটি প্যান সিটি পরিকল্পনা। এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সব শহরের এক-একটি এলাকার নকশা, পরিকাঠামো, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবেশ প্রভৃতি বদলে দিয়ে এলাকাটিকে বদলে ফেলা। অন্যদিকে প্যান সিটি পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে স্মার্ট প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার করে শহরের

[লেখক 'National Institute of Urban Affairs'-এর অধ্যাপক। ই-মেল : usha16ji@gmail.com]

প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিকে উন্নততর করে তোলা। তবে বাসসংস্থানের বিষয়টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বা অম্রুত (AMRUT) প্রকল্পে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, যদিও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মূল বিষয়গুলির মধ্যে সাধ্যায়ত্ত বাসসংস্থান, বিশেষত গরিবদের জন্য, তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। স্মার্ট সিটি প্রকল্প ও অম্রুত (AMRUT), এই দুই প্রকল্প মিলিয়ে আশা করা যাচ্ছে 'সবার জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই' সরকারের এই লক্ষ্যকে সফল করে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) বা 'সবার জন্য আবাস' প্রকল্পের সূত্রপাত ২০১৫ সালে। আশা করা হচ্ছে ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করে ফেলা যাবে। এই প্রকল্পে পুরসভাগুলিকে কেন্দ্রীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৪০৪১-টি বিধিভুক্ত শহরকে ধাপে ধাপে আনা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে ৫০০-টি প্রথম শ্রেণির শহর। হিসাব যা করা হয়েছে, তাতে এই প্রকল্পে সবার মাথার উপরে ছাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য ২ কোটি বাড়ি তৈরি করতে হবে। আধুনিক, সবুজ প্রযুক্তি ও পরিবেশ-বান্ধব নির্মাণ সামগ্রী বা উপকরণ ব্যবহার করে সরকার এই বাড়িগুলি তৈরি করতে চাইছে।

গরিবদের জন্য বাড়ি

স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য যে শহরকে বেছে নেওয়া হবে, এটা একান্তভাবে সেই শহরের বিষয় যে সে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য কোনও বস্তি এলাকাকে বেছে নেবে কি না। স্মার্ট সিটি পরিকল্পনার বাসসংস্থান অংশে নানা ধরনের প্রকল্পের, যেমন বস্তি পুনর্বাসন, বস্তি পুনঃউন্নয়ন, আর্থনীতিকভাবে দুর্বল ও নিম্ন আয় শ্রেণির মানুষদের জন্য সাধ্যের মধ্যে বাড়ি, ভাড়ার বাড়ি, প্রভৃতি প্রকল্পের কথা বলা আছে। তবে সব স্মার্ট সিটি পরিকল্পনাতেই কিন্তু এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাসসংস্থান বা বস্তি উন্নয়নের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ৬০-টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মধ্যে ১৪-টিতে। যেমন আমেদাবাদ, ভুবনেশ্বর ও ধরমশালাতে বাসসংস্থানের কথা আছে, নেই কানপুর, গোয়ালিয়র ও লুধিয়ানাতে।

চিত্র-১

চিত্র-২

Building Highlights

- Total built-up area : 1981 sq.ft.; construction cost @ Rs. 23 Lakhs.
- Houses four typical flats : two for EWS (269 sq. ft. carpet area) and two for LIG (497 sq. ft.)
- Units can be scaled both horizontally and vertically (up to 8 storeys).
- Extension of technology originally developed by Rapidwall Building Systems, Australia to a total GFRG building system, with GFRG floor slabs and earthquake resistant features, and indigenous waterproofing solutions.

  Advantages :
  - Rapid construction (superstructure completed in 30 days);
  - Panels (124 mm thick) with cavities (suitably filled with reinforced concerte), can be assembled and erected easily—for all walls and floors and staircases;
  - No plastering required (on account of excellent finish of panels);
  - Energy efficient : less consumption of cement, sand, steel and water; recycling of industrial waste gypsum.
- R&D supported by Department of Science & Technology (DST);
- Four PhD scholars have contributed to the R&D since 2004.
- GFRG panels sponsored by Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), Govt. of India.
- Design and construction guidelines developed by IIT Madras and approved by Building Materials Technology Promotion Council (BMTPC), Govt. of India.

চিত্র-১ ও ২ : মাদ্রাজ আইআইটি-তে GFRG প্যানেল-নির্মিত বাড়ি

সূত্র : লেখক

কীভাবে এলাকা উন্নয়নের মধ্যে বাসসংস্থানের কথা বলা হয়েছে তার দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

১. আমেদাবাদে নানা প্রকল্পের, যেমন মুখ্যমন্ত্রী গৃহ আবাস যোজনা, বি এস ইউ পি, আর এ ওয়াই, গুজরাট স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি এবং হাউজিং পলিসি আন্ডার সাফাই কামদার যোজনার মাধ্যমে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে ৪০,০০০-এরও বেশি সাধ্যায়ত্ত বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২. ভুবনেশ্বরে 'মিশন আবাস'-এর অধীনে

৬,০০০ বাড়ি নির্মাণ করা হবে। ভুবনেশ্বরের এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আছে বস্তি পুনর্গঠন, সাধ্যায়ত্ত বাসসংস্থান, নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ভাড়ার বাড়ি, কর্মরত মহিলাদের হোস্টেল এবং গৃহহীনদের আশ্রয়। মিশন আবাসের অধীনে যে বস্তি পুনর্গঠন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, আশা করা হচ্ছে তাতে ২৪-টি বস্তির মানুষকে ৪-টি আবাসনে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে।

৩. ধরমশালায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে ৩৫০০-টি বাড়ি নির্মাণ করা হবে তার মধ্যে ১২৫০-টি বরাদ্দ থাকবে বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সঙ্গে যুক্ত করে এই পরিকল্পনাটির রূপায়ণের কাজ করা হবে।

এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং অন্যান্য স্থানীয় স্তরের বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বাসস্থানের ব্যবস্থাপত্র করে দেওয়া হবে।

স্মার্ট সিটি প্রকল্প বর্তমানের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে শহরগুলিকে পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বাসসংস্থানের বিষয়টিকে জড়িয়ে নিয়ে সুসংহত এলাকা উন্নয়নের এই পরিকল্পনা উন্নত জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন-সহ সুস্থায়ী উন্নয়নের সুযোগ করে দিচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, স্মার্ট সিটির সুযোগ গরিবদের কাছেও গিয়ে পৌঁছাবে।

চ্যালেঞ্জ

অবশ্য লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছোনোর আগে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার ব্যাপার আছে। বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে বস্তি যেখানে ছিল সেখানেই নতুন করে তাদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু সেই বিকল্পটির কথা যেমন বিশেষ ভাবা হয়নি, তেমনই সর্বত্র এটির প্রয়োগও সম্ভব নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে তাদের দূরে কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই কৌশল যদিও মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, তবুও যে এমন করা হয়েছে তার কারণ, শহরের মধ্যে যে বহুমূল্য জমিগুলি তারা দখল করেছিল, সেগুলি ফাঁকা করে সেখান থেকে

চিত্র-৩

তিরুবনন্তপুরমের করিমাদম কলোনি

সূত্র : https://keralasandarshanam.wordpress.com/2012/03/02/march-2-2012/#jp-carousel-4

যত বেশি সম্ভব আয়ের বন্দোবস্ত করা। সর্বাত্মক পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে কোনও একটি জায়গার যখন পুনঃউন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তখন সব শ্রেণির আয়ের মানুষদেরই সেই স্থানে জায়গা করে দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কৌশলটি গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল যে বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুস্থায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি কৌশল ও উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার। গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়াটা যেন কেবল লক্ষ্যপূরণের তাগিদ না হয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হবে। দেখতে হবে এর ফলে যেন গরিবদের জীবনযাত্রার মানের সত্যিকারের উন্নতি ঘটে। আর সেটা করতে গেলে দরকার উন্নতমানের এবং সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য সামগ্রী দিয়ে বাড়িগুলি বানানো। অর্থাৎ, স্মার্ট সিটিতে গরিবদের বাড়ি বানানোর সময় যেমন বাড়িগুলির নির্মাণ নকশা গরিবদের ব্যবহার উপযোগী হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনই লক্ষ্য রাখতে হবে কম খরচে মজবুত নির্মাণের দিকেও।

স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে আরও একটা চ্যালেঞ্জ শহর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের নকশা তৈরি থেকে রূপায়ণ পর্ব পর্যন্ত সর্বস্তরে বস্তিবাসীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা দরকার। বেসরকারি ক্ষেত্রকেও এই ধরনের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল হতে হবে।

বলা হচ্ছে, 'স্পেশ্যাল পারপাস ভেহিকল'-এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটি মিশনকে রূপায়ন করতে যাওয়া দারিদ্র্যবিরোধী পদক্ষেপ হয়ে যাবে। কারণ, বেসরকারি ক্ষেত্র কখনওই গরিবদের বাড়ি তৈরির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হবে না। তারা যে মডেলটি অনুসরণ করতে চাইবে তা হল প্রথমে উচ্ছেদ, পরে পুনর্বাসন। 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্পটিকে যখন স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সঙ্গে একত্রে রূপায়ণ করতে যাওয়া হবে তখন এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হবে তা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে।

বাসসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ভাড়ার বাড়ির। মালিকানা ভিত্তিক বাড়ি বানিয়ে দিয়ে বস্তি সমস্যার সমাধান করা যাবে না। গরিব এবং অন্যান্য শ্রেণির আয়ের মানুষদের জন্যও শহরগুলিতে ভাড়ার বাড়ির দরকার; কারণ, তাদের অনেকেই কাজের সূত্রে শহরে আসেন, স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে নয়। ফলে নতুন বস্তি গজিয়ে ওঠা রুখতে 'সাধ্যের মধ্যে ভাড়ার বাড়ির বন্দোবস্ত' করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন আয়ের মানুষজনের জন্য বাড়ি-ঘরের বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান করাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। সরকার সুদের উপর ভরতুকি দিচ্ছে সেটা ভালো কথা, কিন্তু তার আগে তো দেখতে হবে এই ভরতুকির সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা যেন ঋণ নেবার সুযোগগুলো ঠিকঠাক পায়।

আবাসন প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রকল্প শেষ করতে দেরি করা হয়। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন বের করে আনাটা বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। এর ফলে যে শুধু খরচ বেড়ে যায় তাই-ই নয়, প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। যখন বস্তি পুনর্গঠনের কথা ওঠে, তখন কিছুদিনের জন্য বস্তিবাসীদের অন্তর্বর্তীকালীন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। স্মার্ট সিটিতে এই অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্তটুকু করতে হয় স্মার্ট ভঙ্গিতে।

সুযোগসমূহ

সকলের জন্য আবাস আর স্মার্ট সিটি, এই দুই প্রকল্প একত্রে শহরগুলির সামনে গরিবদের জন্য উদ্ভাবনী বাসস্থানের সংস্থান করে দেবার বিপুল সুযোগ এনেছে। নতুন বাড়িগুলিকে শক্তি সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা যেতে পারে। শক্তি সাশ্রয়ী মানে এমনভাবে বাড়িগুলিকে গড়ে তোলা যাতে ভালোরকম আলো-হাওয়া ঢোকার রাস্তা থাকে, বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় কম। সেই সঙ্গে ছাদ ঠাণ্ডা রাখার কোনও একটা ব্যবস্থাও করা যায়, যাতে করে গ্রীষ্মকালে তাপের প্রকোপটাও কমে। আবহাওয়ার বদল উত্তাপ বাড়াচ্ছে, তার ফল তো সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হবে গরিবদেরই। গরিবদের জন্য বাড়িগুলিকে তাই সুস্থায়ী ও পরিবেশ-বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

যখন বাড়ির নকশা হবে উল্লম্ব, মানে তৈরি করা হবে বহুতল, দেওয়ালের ইঁট, জানলা, দরজা সব তৈরি করা যেতে পারে উদ্ভাবনী সব সামগ্রী দিয়ে, যেমন পুনর্ব্যবহৃত ধাতু, প্লাস্টিক বা পার্টিকল বোর্ড দিয়ে। তাছাড়া স্থানীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে খরচ কমানো যেতে পারে। উদ্ভাবনী উপাদানের একটা উদাহরণ হতে পারে গ্লাস ফাইবার রিইনকোর্সড জিনসাম প্যানেল। এমন প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে মাদ্রাজ আইআইটি-তে (চিত্র ১ ও ২ দ্রষ্টব্য)।

একটি বাড়ির নকশার দু'টি অংশ—একটি স্ট্রাকচারাল ফ্রেম, অন্যটি দেওয়াল, জানলা, দরজা ইত্যাদি। উল্লম্ব বাসস্থানের ক্ষেত্রে কাঠামোটি হবে আরসিসি বা পিএসসি ধরনের। আর জানলা-দরজাগুলি রিসাইকেলড মেটেরিয়াল, যেমন প্লাস্টিক বা বোর্ড দিয়ে হতে পারে।

চিত্র-৪

তিরুবনন্তপুরমের করিমাদম কলোনি
সূত্র : লেখক

গরিবদের বাড়িগুলির নকশা তৈরি করার সময় পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি এমন জায়গা রাখা দরকার যাতে তারা তাদের জীবিকার্জনের জন্য বিবিধ কাজ কারবার সেখানে করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হতে পারে কস্টফোর্ড (লরি বেকার সেন্টার ফর হ্যাবিট্যাট স্টাডিজ)-এর নকশা করা তিরুবনন্তপুরমের করিমাদম কলোনি।

স্মার্ট সিটিগুলির উচিত গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরিতে উদ্ভাবনী ভাবনার ব্যবহার করা। গরিবদের জীবিকা উপার্জনকে নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা তখনই সম্ভব যখন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করার বিষয়টি কেবলমাত্র লক্ষ্যপূরণ কার্যসূচি হয়ে উঠবে না। যতক্ষণ না আমরা স্মার্ট সিটির শেষ লোকটিকে পর্যন্ত উন্নততর মানের জীবনযাত্রা উপহার দিতে পারব ততক্ষণ স্মার্ট সিটি একটি অভিজাত ধারণা হয়েই থেকে যাবে, যে ধারণা কেবল 'আরও ভালো'র কথা বলে, অন্য কিছু নয়।❑

NEW HORIZON STUDY CIRCLE

WBCS (Gr-A), 2016

Suman Rajbangshi
Roll No. - 1500149, ADSR

"I am an IAS aspirant. However, in the mid way of my preparation I have achieved a partial success having been selected as an WBCS officer. For my success I wish to record my gratitude to T. Hossain sir and his NHSC. Truly, he is my friend, philoshopher and guide."

WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation

General Combined Course
IBPS, Central/State level SSC, Railway etc.

Only Mock Tests Program.

Provision of Notes and Essential Books

Contact
Immediately for Compulsory Economics
Classes of Tojammel Hossain
Ph - 9836484969

WBCS (Exe.) 2015

Erfan Habib
Deputy Collector &
Deputy Magistrate.

"সাফল্যের ফ্রেমে আঁটা "New Horizon Study Circle" এর উদগাতা তুজামমেল হোসেন স্যারকে আমি একটু পরে পেয়েছিলাম। তবে, স্যারকে অন্যদের পরে পাওয়ায় আমি খুব সহজেই অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি সম্প্রতি এই রাজ্যের WBCS (Exe.) পরীক্ষার কোচিং দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ প্রতীম। প্রশিক্ষণে তার উৎকর্ষতা অতুলনীয়।"

First of all, I want to give thanks to my 'Guru' in Economics Tojammel sir and his esteemed team of my alma mater 'New Horizon study circle'. They helped me to stay on the right path and provided me right guidance throughout the journey of my civil service exam preparation. Subject wise strategy with handwork helped me to achieve this feat.

Dr. Dipanjan Jana [WBCS (Gr. A), 2016], R.No. - 0105201
W.B. Food & Supplies Officer Departmental Rank - 3

আমি বর্তমানে একটি ব্লকে APO হিসাবে কাজ করছি এবং WBCS (2015) পরীক্ষায় চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয়ে Inspector of Co-operative Society পদে চাকরি পেয়েছি। আমার সাফল্যে তুজামমেল হোসেন স্যারের অবদান অনস্বীকার্য। শুধু শিক্ষক হিসাবেই নয় ব্যক্তি হিসাবেও তিনি একটি মূর্ত প্রতীক এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি জাতীয় সংহতির প্রতীক তা অকপটে বলা যায়।

Ramanth Das (WBCS, 2015)

Ajijul Shaikh (WBCS) Group-A

Shayan Ahmed (WBCS) DSP

Surajit Mondal (DSP)

Durbar Banerjee (DSP)

Md. Saifur Rahaman (WBCS) C.T.O

Piyali Mondal WBCS (Exe.) BDO

Sam Mohammed SK. (WBCS) Group-C

Chitra Majumdar (WBCS) JSWS

Souvik Chattejree (WBCS) R.O.

Dip Sankar Das (WBCS) R.O.

Kalyan Laha (WBCS) Jt. BDO

Tarikul Islam (WBCS) R.O.

Rathin Sarkar (WBCS) Group-C

Nilanjan Sinha (WBCS) Group-C

Eleyas WBP (S.I.)

Mofijur Rahaman (WBCS) ACTO

Anjan Chatterjee (A.P.O)

Monirul Islam (WBCS) R.O.

Sounak Banerjee (WBCS) Group-A

Chandrani Bandhyapadhyay (WBCS) Group-C

তুজামমেল হোসেন-এর নিউ হরাইজন পাবলিকেশনের বইগুলি WBCS (Preli. & Mains) ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা

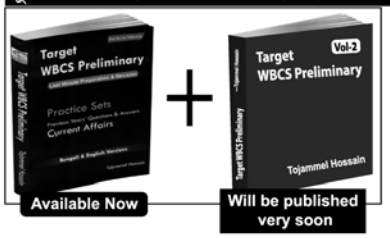

Available Now | Will be published very soon

Available Now | Available Now | Available Now | Available Now | Available Now

... etc.
Available Now | Available Now

NEW HORIZON STUDY CIRCLE & NEW HORIZON PUBLICATION OF
T. Hossain

C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007
Phone : 033-22416899 / 9836484969
E-mail : collegestreet.newhorizon@gmail.com | Website : www.newhorizonstudy.com

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

আবাসন ও পরিকাঠামো : প্রশাসনের অগ্রাধিকার

কৃষ্ণ দেব

সর্বশেষ ২০১১ সালের জনগণনার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শহরবাসী মানুষের জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩৭৭ মিলিয়নে। অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ ৩২ শতাংশের আশেপাশে। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামীণ ভারতে আবাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭.৭ মিলিয়ন ইউনিট। হিসাব করে দেখা গেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের শহরগুলিতে ৫৯০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করবে। এই পরিমাণ জনসংখ্যার বিচারে শহরাঞ্চলে আবাসনের ঘাটতি পৌঁছাবে ১৮.৮ মিলিয়ন ইউনিটে।

স্বাধীনতার ঠিক পর পরই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশে সরকারি আবাসন কর্মসূচি (Public Housing Programme) চালু করা হয়। সেই সময় থেকেই দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম এক হাতিয়ার হিসাবে এই ক্ষেত্রটি সরকারের বিশেষ মনোযোগ কেড়ে এসেছে।

আবাস মানুষের জীবনের এক প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। একই সাথে তা নির্মাণ শিল্পের তথা অথনীতিরও অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বর্তমান মূল্যে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এ নির্মাণ ক্ষেত্রের অবদান ৮ শতাংশ। এছাড়াও এই ক্ষেত্রটিতে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মনিযুক্তি ঘটে থাকে। আর্থিক কর্মকাণ্ডে অবদানের নিরিখেও এই ক্ষেত্র দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, কৃষিক্ষেত্রের পরেই। ভারতে সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসে পরিষেবা ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ঘটে নির্মাণ ক্ষেত্রে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে মোট ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় নির্মাণ ক্ষেত্রে, যা আদতে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে থাকে।

সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকে শহরগুলিতে। সামগ্রিকভাবে দেশের যা গড় মাথা পিছু আয়, ভারতের কিছু বড়ো বড়ো শহরে মাথা পিছু আয় তার থেকে অনেক অনেক বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো তা জাতীয় গড়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়াও জাতীয় ও গ্রামীণ অর্থনীতির সাথেও শহরগুলি বিশেষভাবে বিজড়িত।

বর্তমান সময়ে অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রগুলিতে অতিদ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে, তার মধ্যে অন্যতম হল আবাসন শিল্পক্ষেত্র। বিপুল জনসংখ্যা, আয়স্তর বৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়নের সূত্রে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির লেখচিত্রে এই ঊর্ধ্বগতি। ২০০১ সালে গোটা দেশে ২৮৬ মিলিয়ন মানুষের বাস ছিল শহরাঞ্চলে। গোটা বিশ্বে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার নিরিখে তা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

২০১১ সালের জনগণনার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শহরবাসী মানুষের জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩৭৭ মিলিয়নে। অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ ৩২ শতাংশের আশেপাশে। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামীণ ভারতে আবাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭.৭ মিলিয়ন ইউনিট। হিসাব করে দেখা গেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের শহরগুলিতে ৫৯০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করবে। এই পরিমাণ জনসংখ্যার বিচারে শহরাঞ্চলে আবাসনের ঘাটতি পৌঁছাবে ১৮.৮ মিলিয়ন ইউনিটে।

এই জনসংখ্যা কিন্তু বেশ বিপুল। এদের জন্য পরিবহণ পরিষেবার সংস্থান করার বিষয়টি নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। নতুন নতুন গড়ে

[লেখক পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন যোজনা কমিশন, বিশ্বব্যাঙ্ক ও RITES Limited-এর সঙ্গে। ই-মেল : kd.krishnadev@gmail.com]

ওঠা এলাকা ও ছোট শহরগুলিতেও পরিবহণের ক্ষেত্রের উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই সংকট লাগাম ছাড়া রূপ নেওয়ার আগেই তার মোকাবিলার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া জরুরি। ছোটো ও মাঝারি শহর এবং বড়ো মাপের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে পরিবহণ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ও সমস্যার নিরিখে বিস্তর ফারাক; একই কথা খাটে মেট্রো সিটি বা মহানগরগুলির ক্ষেত্রেও। কাজেই, মহানগরের পরিবহণ সমস্যার মোকাবিলায় যে নিদান শহর পরিকল্পকরা দিয়ে থাকেন তা ছোটো-বড়ো-মাঝারি শহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলির ক্ষেত্রে খাটবে না। মুড়ি-মুড়কির এক দর, এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।

২০০১ সালে ভারতে শহরের (Town) সংখ্যা ছিল ৫,১৬১। ২০১১ সালে তা বেড়ে হয় ৭,৯৩৫। গত এক শতক জুড়েই নগরায়ন বেড়েছে দ্রুত হারে। ফলত তার সাথে তাল মিলিয়েই উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রেণি ইত্যাদি নির্বিশেষে অবিরত বেড়েছে শহর ও নগরবাসী জনসংখ্যাও। শহরাঞ্চলের বৃদ্ধির রূপরেখা অনুযায়ী, শহরবাসী জনসংখ্যার সিংহভাগ ঠাঁই নিচ্ছে প্রথম শ্রেণির শহরগুলিতে। আর এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আজকের দিনে শহরবাসী মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে সেই জনপদগুলিতে, যেখানকার জনসংখ্যা এক লক্ষ ছাপিয়ে গেছে (প্রথম শ্রেণির শহর)। শহরগুলিকে আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে মহানগর, দশ লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, পাঁচ লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, এরকম বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে থাকি। এই সবরকম শ্রেণির শহরের সংখ্যাই দিন দিন বাড়ছে। শহরাঞ্চল পরিবহণ ব্যবস্থাপনার জন্য কোন ধরনের শহরে কী কৌশল কাজে আসবে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা অবকাশ রয়েছে।

শহরাঞ্চলে আবাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা সরবরাহের প্রশ্নে উঠে আসা ইস্যুগুলির মোকাবিলার সরকারের তরফে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে পরিষেবার নিয়মবিধি ও মান কী হবে তা ঠিক করার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬৩ সালে, জাকারিয়া কমিটি গঠনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক সরকারি কমিটি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় এই একই কারণে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

- শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান (১৯৭৪),
- পরিকল্পনা কমিশন (১৯৮৩, ১৯৯৯),
- কর্মচালনা গবেষণা গোষ্ঠী (১৯৮৯),
- নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার (১৯৯১),
- কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান (১৯৯৯),
- ভারতীয় নগর পরিকাঠামো ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইশার জাজ আলুওয়ালিয়া কমিটি (২০১১),
- জাতীয় নগর পরিবহণ নীতি (২০০৬), এছাড়াও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন পরিষেবার জন্য নিয়মবিধি লাগু করে,
- ১৯৮৮ সালের জাতীয় আবাসন নীতি।

পাশাপাশি 'জাতীয় আবাসন ব্যাংক' (NHB) এবং 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম' (HUDCO)-এর মতো বহু প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে উল্লিখিত নীতিগুলি রূপায়নের কাজে গতি আনতে। সুনির্দিষ্ট করে নগর আবাসন বিষয়ে প্রথম নীতিটি প্রণয়ন করা হয় ২০০৭ সালে; জাতীয় নগর আবাসন ও বসতি নীতি (NUHHP)। কেন্দ্রীয় "আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক" প্রণীত এই নীতিটিতে সুস্থায়ী নগরোন্নয়নের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসাবে সাধ্যায়ত্ত আবাসের সংস্থানের উপর নজর দেওয়া হয়। তারপর থেকে এই পথ অনুসরণ করে মানুষের সাধ্যের মধ্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

- জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনরুজ্জীবন মিশন (JNNURM) : মিশনের আওতাভুক্ত ৬৫-টি শহরে মিশনের সময়সীমার সংখ্যা (২০০৫-'১২ সাল) গরিব শহরবাসীদের জন্য ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন বাড়ি তৈরি করা এই মিশনের লক্ষ্য। JNNURM'র আওতায় আবাসন বিষয়ক দু'টি সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। সংহত আবাসন এবং বস্তি পুনর্বিকাশ কর্মসূচিটি সরাসরি আবাসন নীতির সঙ্গে জড়িত। গরিব শহরবাসীদের জন্য প্রাথমিক পরিষেবা (BSUP)-এর লক্ষ্য নিম্ন আয়ের শ্রেণিভুক্ত মানুষের জন্য জল, অনাময়-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো নাগরিক পরিষেবাগুলি জোগানোর বন্দোবস্ত করা।
- অংশীদারিত্ব ভিত্তিক সাধ্যায়ত্ত আবাসন (AHP) : বেসরকারি ক্ষেত্রকে জড়িত করে বাজারের চাহিদা মেটানোর পথ অবলম্বন।
- রাজীব আবাস যোজনা (RAY) : শহরবাসী দরিদ্র মানুষের জন্য তাদের সাধ্যায়ত্ত আবাসের বন্দোবস্ত করা।
- সবার জন্য আবাস (HFA) : ২০১৫ সালের মে মাসে 'রাজীব আবাস যোজনা'কে ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস বা "Housing for All"-এর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সব মানুষের সাধ্যের মধ্যে 'মাথার উপর একটি ছাদ', এই লক্ষ্য পূরণে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মোকাবিলার জন্য সুস্থায়ী নীতি গ্রহণ করতে এক কাঠামোর বিকাশ ঘটানো হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে "রাজীব আবাস যোজনা" এবং "২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস", এই দুই নীতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে।

আগামী ২০২২ সালে জাতি তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচাত্তরতম বর্ষপূর্তি উদযাপন করবে। আর সেই বছরটিকেই দেশের প্রতিটি মানুষের মাথার উপর এক চিলতে ছাদের বন্দোবস্তের লক্ষ্য পূরণের জন্য বেছে নিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে এক ব্যাপক আকারের মিশন, "২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস"। এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা খুব সুস্পষ্ট। ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল, এই সাত বছরের মধ্যে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অন্ততপক্ষে দু'কোটির বেশি বাড়ি তৈরি। প্রকল্পটির পোশাকি নাম রাখা হয়েছে "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা" (PMAY)। রূপায়িত হচ্ছে কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষিত কর্মসূচি (CSS) হিসাবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাড়া উপকৃত হবেন? বা অন্য কথায় বলা যায়,

কাদের এই কর্মসূচির উদ্দিষ্ট বলে ধরা হচ্ছে? শহরবাসী গরিব মানুষজন; অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত এবং নিম্ন আয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মূলত দেশের সংবিধিবদ্ধ ৪০৪১-টি শহরেই এদের বসবাস। এর মধ্যে ৫০০-টি প্রথম শ্রেণির শহরে তিনটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

- PMAY প্রথম পর্যায় (এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৭) : মোট একশোটি শহরে এই সময়ের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু ও সমাপ্ত করা হবে।
- PMAY প্রথম পর্যায় (এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৯) : এই সময় পর্বের মধ্যে ২০০-টি শহরকে প্রকল্পের আওতায় এনে বিকাশ ঘটানো হবে।
- PMAY প্রথম পর্যায় (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২২) : এই সময় পর্বে বাদবাকি শহরগুলিকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে উন্নয়ন করা হবে।

অবশেষে ২০১৭ সালের বাজেটে আবাসন শিল্পকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বহুদিন ধরেই আবাসন শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত হর্তাকর্তারা এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এছাড়াও "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা" খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৫ হাজার কোটি থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। ফলত, ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস মিশনকে বাস্তব করে তোলার লক্ষ্য পূরণে দেশে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যে পড়ে এমন আবাসনকেও পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়াটা একারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে এর ফলে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কর্তারা স্বল্প সুদে অর্থলগ্নির জোগাড়যন্ত্র করে উঠতে পারবেন। তাদের কাছে এর দরুন পুঁজির জোগাড়ের অতিরিক্ত একটা পথও খুলে যাচ্ছে।

২০১৭ সালের বাজেটে, সরকার ৬০ মিলিয়ন আবাসের বন্দোবস্ত করারও প্রতিশ্রুতি দেয়। মানুষের সাধ্যের মধ্যে আবাসের সংস্থান করতে ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও পেশ করা হয় এই বাজেটে। যাই হোক হিসাব অনুযায়ী এক্ষেত্রে মোট ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এর মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিনিয়োগই প্রয়োজন হবে মানুষের সাধ্যের মধ্যে আবাস তৈরির জন্য। এই পরিমাণ বিনিয়োগ আসবে কোথা থেকে? সরকার তাই আবাসন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে উঠেপড়ে কোমর বেঁধেছে। সরকারের আরও এক ঘোষিত লক্ষ্য, আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রাম ভারতের নিরাশ্রয় মানুষজন ও কাঁচা বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য ১ কোটি বাড়ি তৈরি। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বিপুল। সেই সূত্রেই বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী বছরগুলিতে নির্মাণ ও স্থাবর সম্পত্তি বা রিয়াল এস্টেটের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগও ঘটবে বিশাল পরিমাণে। সেই বিনিয়োগের দৌলতেই অভূতপূর্ব আর্থিক বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে। যে বৃদ্ধি দেশের শহরগুলিতে নানাবিধ সুযোগসুবিধার পরিসর তৈরি করবে।

ভারতের প্রেক্ষাপটে, এটা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, (নাগরিক ও অন্যান্য) সুযোগসুবিধার সবটুকুই মেলে কেবল শহরে। এড গ্ল্যাক্সার যেমনটা বলেছেন, "শহর গরিব মানুষদের তৈরি করে না; তাদের আকর্ষণ করে"। আর শহরমুখী অন্তহীন জনস্রোতের পেছনে আর কোনও কারণ নেই, আছে কেবল এই "আকর্ষণ"। গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমানো মানুষ প্রথমেই যে সমস্যার মুখে পড়ে, তা হল মাথা গোঁজার ঠাঁই ও অন্যান্য প্রাথমিক নাগরিক পরিষেবার গুরুতর অভাব। যেমন কি না জল, অনাময় ব্যবস্থা, পরিবহণ ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে সব কাজে এরা নিযুক্ত হয়, তাতে সারা বছর ধরে কাজের সুযোগ নেই। যেমন কি না নির্মাণ ক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। কাজেই, শ্রমিক-কর্মীরা মাঝে মাঝেই কর্মহীন হয়ে পড়ে। ফলত, তারা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতে থাকেন। শোষণের শিকার হন। এদের মধ্যে বিশেষ করে যারা অল্প কিছুদিনের জন্য শহরে আসেন, তারা শহরের বস্তিগুলোতে ডেরা বাঁধতে বাধ্য হন। বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় এরা সবসময় কাঁটা হয়ে থাকেন; উচ্ছেদের খাঁড়া মাথায় উপর ঝুলতে থাকে। কেউ কেউ আস্তানা গড়েন শহরের ফুটপাথ ও পার্কের মতো জায়গায়। স্বাভাবিকভাবেই জীবনধারণের ন্যূনতম পরিষেবার নাগালও পান না এরা। তার উপর আবার আছে হয়রানির শিকার হওয়ার আশঙ্কা। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর দিন দিন বাড়ছে। সেই আকর্ষণে কাজের খোঁজে গ্রামের মানুষের শহরে পাড়ি জমানোর ঘটনায় বাড়ছে বহুগুণ। এদিকে সেই অনুপাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই একেবারেই অপ্রতুল। ফলত, বস্তিতে থাকার জায়গা না মিললে এরা বেআইনি কলোনির মতো আস্তানা তৈরি করে নিচ্ছে। জনসংখ্যার বিপুল বৈচিত্র্য, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্তর একাকার হয়ে

"প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা" খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৫ হাজার কোটি থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। ফলত, ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস মিশনকে বাস্তব করে তোলার লক্ষ্য পূরণে দেশে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যে পড়ে এমন আবাসনকেও পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়াটা একারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে এর ফলে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কর্তারা স্বল্প সুদে অর্থলগ্নির জোগাড়যন্ত্র করে উঠতে পারবেন। তাদের কাছে এর দরুন পুঁজির জোগাড়ের অতিরিক্ত একটা পথও খুলে যাচ্ছে।"

যাওয়া এবং সম্প্রদায়ের ছত্রচ্ছায়া প্রতি বর্গ কিলোমিটর এলাকা পিছু যে কোনও ব্যক্তি বিশেষের জন্য জীবিকার্জনের প্রচুর সুযোগ তৈরি করে দেয়; অন্য কোথাও যার অবকাশ নেই।

আবাসন ও নগর পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের নিরিখে যে বড়ো মাপের চ্যালেঞ্জগুলি বাজারের সামনে রয়েছে, তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল এখানে।

- **রূপায়ণ পর্ব শুরুর আগে জটিল ও দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়া :** জমির চরিত্র বদল, বিল্ডিং প্ল্যান যাচাই ও তার অনুমোদন, নির্মাণকার্য শুরু করার পারমিট ও অন্যান্য বিবিধ সরকারি বিভাগ ও দপ্তরের থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ NOC জোগাড় ইত্যাদি এর মধ্যে কয়েকটি। এসব শেষ করে কাজ করে উঠতে বিভিন্ন রাজ্য ভেদে কম-বেশি বছর দুয়েক সময় লেগে যায়। এর মধ্যে বেড়ে যায় প্রকল্প ব্যয় তথা নির্মাণকার্য শেষ করার সময় সীমাও। কাজেই শহরের গরিব বাসিন্দাদের জন্য তাদের সাধ্যায়ত্ত আবাস তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই অন্তরায় নজরে পড়ে।
- **পর্যাপ্ত বাহ্যিক পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা :** বেশ কিছু রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার সাধনে অতিসক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে তারা। মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক, এই দু'টি রাজ্যের উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

আগামী ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাস কর্মকাণ্ডের এখনও পর্যন্ত যা অগ্রগতি চোখে পড়ছে, তাতে করে সত্যি সত্যি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণ করতে হয়, বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত ইস্যুর উপর বিশেষ করে জোর দিতে হবে। শুধু আবাসন গড়ে তোলা নয়, সেখানকার বাসিন্দারা যাতে সুষ্ঠুভাবে, সুস্থিত পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য জল, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ, নির্মল পরিবেশ এসবেরও সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতে হবে। তা না হলে, ভবিষ্যতে আবাসন সোসাইটিগুলি ধীরে ধীরে ছন্নছাড়া দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ফলত এর আশপাশের এলাকায় বস্তি গড়িয়ে উঠে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

জন, অনাময় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য

ভারতের শহরগুলিতে জল সরবরাহ ক্ষেত্রে প্রতি ঘরে ঘরে জোগানের বন্দোবস্ত করে ওঠা যায়নি এখনও পর্যন্ত। এছাড়াও রয়েছে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা জল সরবরাহে অপারগতা, সরবরাহ করা জলের নিম্ন মান ও নলে জলের চাপ কম থাকায় সরু সুতোর মতো ধারায় জল পড়া। শহরবাসী জনসংখ্যার উল্কাগতিতে বৃদ্ধি তথা শহরের গণ্ডি ক্রমশ বাড়তে থাকায় জল সরবরাহ ক্ষেত্রে এই সব অব্যবস্থা কাটিয়ে ওঠা আশু প্রয়োজন।

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, সোয়াইন ফ্লু, ডায়ারিয়া, হাঁপানি, শ্বাসযন্ত্রে তীব্র সংক্রমণের মতো রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবের পেছনে জল, বায়ু ও সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণের অবদান যথেষ্ট। ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৯ সালে একটি সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, অনুন্নত স্যানিটেশন বা অনাময় ব্যবস্থার কারণে দেশের শহরাঞ্চলে চোদ্দ বছরের কম বয়সি প্রায় ২৩ মিলিয়ন শিশু-কিশোরকিশোরীর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে আছে। একই সমীক্ষায় আরও উঠে এসেছে, জল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুণমানের ঘাটতি থাকায় শহরাঞ্চলের ৮ মিলিয়ন শিশুর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রতি হাজার জন জীবিত শিশু জন্ম পিছু শিশু মৃত্যু হার ৪২। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কম বটে; কিন্তু এই হার বেশ বেশিই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শহরাঞ্চল জল সরবরাহ অপর্যাপ্ত। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও খারাপ যন্ত্রাংশ বা পাইপ ইত্যাদি বদলে না ফেলার মতো কারণে জল বণ্টন নেটওয়ার্কে প্রযুক্তিগত অপচয় ঘটে। জলের মিটারের ক্ষেত্রে ত্রুটি, বিনা মাশুলে জল ব্যবহার, এবং সরাসরি জল চুরি; জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ক্ষতির কারণ। এই সমস্ত কার্যকারণের ফলস্বরূপ ভারতে অধিকাংশ জায়গাতেই জল থেকে রাজস্ব আদায়ের ঘরে মা ভবানী। বহু জায়গাতেই কোনও রকম নজরদারী ব্যবস্থা নেই, কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে উন্নতির পথে হাঁটলে কোনও পুরস্কারের অবকাশ নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারতে শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ অন্যতম নিম্ন মানের পরিষেবা জোগানের ছবিটা তুলে ধরে। সরবরাহ ব্যবস্থার ভৌত পরিকাঠামোর অতি জঘন্য রক্ষণাবেক্ষণ, জলের মাশুল আদায়ের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার অভাব, জলের সূত্রে রাজস্ব আদায়ের আণুবীক্ষণিক পরিমাণ ইত্যাদি আজ শহরাঞ্চলে জল সরবরাহের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

এর পাশাপাশি, এদেশের শহরগুলির সামনে সবচেয়ে বেশি করে প্রাকৃতিক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্যা, ভূমিক্ষয় ও জলদূষণ। জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটা ক্রমশ নিতান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের আবাসনগুলির জন্যও পাইপ বাহিত পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয়ভাবে গড়ে তোলা বড়ো মাপের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প উপকারে লাগে কম, অপকার করে তুলনায় বেশি। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের এই বোধোদয়। বিকল্প হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত জল ব্যবস্থাপনার মডেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা যেতে পারে শহরে পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্য পূরণে।

নিকাশি পরিষেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে দু'টি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। এক তো গোটা নিকাশি ব্যবস্থায় কোথাও নালার/পাইপের গতিপথ রুদ্ধ না হয়ে পড়ে তা দেখা; আর দ্বিতীয়টি হল, কোনও 'লিকেজ' যাতে না হয়, সে দিকে কড়া নজর রাখা। গোটা শহরের/অঞ্চলের নিকাশি বর্জ্য এমনভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তা কোনওমতেই নদীনালা, জলের বিবিধ উৎস এবং সার্বিকভাবে পরিবেশের সংস্পর্শে না আসে। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতে বাস্তব পরিস্থিতি এসব আদর্শ মানের ধারে-কাছেও আসে না। জল সরবরাহ এবং অনাময় ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা মোটের উপর বহু জায়গাতেই পৌঁছে দেওয়া যায়নি। আবার যেসব এলাকায় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয়েছে; সেখানেও সেই পরিষেবার মানে ঘাটতি রয়ে গেছে। হয়

জলের গুণমান খারাপ, অথবা চব্বিশ ঘণ্টা জল পাওয়া যায় না। ফলত জনস্বাস্থ্যের উপর তার কুপ্রভাব বেশ চোখে পড়ে।

- ভারতে ৫১৬১-টি নগর/শহরের মধ্যে ৪৮৬১-টিতেই এমনকি আংশিকভাবেও বর্জ্য নিকাশি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি।
- এমনকি ব্যাঙ্গালুরু বা হায়দ্রাবাদের মতো শহরেও মোটের উপর প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবারের আবাসের সাথে বর্জ্য নিকাশি সংযোগ নেই।
- দেশের প্রায় ১৮ শতাংশ শহরবাসী পরিবার কোনওরকম শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ পায় না। তারা উন্মুক্ত স্থানেই শৌচকর্ম করে।
- সড়ক নেটওয়ার্কের ২০ শতাংশেরও কম রাস্তার ধারে বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য ড্রেন আছে।

শহরের সংখ্যা ও এলাকা বৃদ্ধির সাথে ভবিষ্যতে পাল্লা দিয়ে বাড়বে মিষ্টি জল বা পানীয় জলের তথা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জলের চাহিদাও। শহুরে এলাকায় যে বর্জ্য জল উৎপন্ন হয়, তার সিংহভাগই পরিশোধনের কোনও ব্যবস্থা নেই তথা সেভাবেই তা সীমিত সংখ্যক যে মিষ্টিজলের উৎস আছে সেখানে গিয়ে মেশে। কাজেই আরও একদফা তীব্র জলসঙ্কটের কারণ ঘটে। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জল ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত জল উভয়ই পরিশোধনের জন্য জল পরিশোধনাগারের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্জ্য জল পরিশোধনের অভাবে ভারতে জলবাহিত রোগব্যাধির যথেচ্ছ বাড়বাড়ান্ত। সে কারণেই বছরে এ ধরনের রোগের চিকিৎসা খাতে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয়িত হয় (CII এবং CEEW, ২০১০)। কাজেই পানীয় জলের সরবরাহের পাশাপাশি বিশেষ করে নজর দিতে হবে বর্জ্য নিকাশি নালা, শৌচালয় ব্যবহারের পরিসর বাড়ানোর দিকেও।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। ভারতে শহরাঞ্চলে প্রতিদিন যে পরিমাণ কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা পরিশোধনের পর ঠিকানা লাগানোটা এক বেশ বড়োসড়ো মাথাব্যথার কারণ। যদিও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় অনেক কম হারে। তবে এদেশে না তো গৃহস্থঘরে না পৌরসভাগুলির অভ্যাস আছে পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে মিশে যেতে পারে এমন পচনশীল (Bio-degradable) কঠিন বর্জ্যকে প্লাস্টিক ইত্যাদির মতো অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য পদার্থের থেকে আলাদাভাবে পরিশোধন করা ও তার সঠিক রীতি মেনে অপসারণের। এভাবে কঠিন বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে তার ব্যবস্থাপনার দৌলতে উপকারের বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতারও বেশ অভাব। জঞ্জাল ফেলার জায়গা থেকে নিয়মিত তা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণের ধার ধারা হয় না। এ সংক্রান্ত আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেমন তেমন করে তার অপসারণ করে দায়সারা হয়। ভারতে পৌরসভাগুলির কঠিন বর্জ্য বিধি লাগু হয় সতেরো বছর আগে, সেই ২০০০ সালেই। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগের হয় অতি দায়সারাভাবে।

বাস্তবে কিন্তু গোটা দেশে যে পরিমাণ কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তার সিংহভাগই (প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশি) পচনশীল এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশে মিশে যেতে পারে। কাজেই এ থেকে জৈবসার উৎপাদনের সুবর্ণসুযোগ আছে। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনশৈলী। বিশেষ করে বড়ো শহরগুলিতে। প্যাকেজিং সামগ্রীর ব্যবহার প্রভূত বাড়ছে সেই সূত্রে। সে কারণেই মাথা পিছু বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১ দশমিক ৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পচনশীল বর্জ্য সামগ্রীর অংশভাক ভবিষ্যতে আরও অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। যাই হোক, ভারত সরকার বিগত ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর তারিখে চালু করে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"। নির্ধারিত লক্ষ্য, আগামী ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে দেশকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন করে তোলা।

পরিবহণ ব্যবস্থা

'নগর পরিবহণ' (Urban Transport) কথাটির ব্যপ্তি বিশাল। এ এমন এক ক্ষেত্র যার আওতায় আসে শহরের অভ্যন্তরে চলাচলকারী বিভিন্ন ধরনের যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যান পরিবহণ। পায়দল চলাচল, সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদির মতো মোটরবিহীন যান, ব্যক্তিগত যানবাহন (অর্থাৎ কিনা চার চাকার মোটরগাড়ি ও দু'চাকার মোটর সাইকেল), বাস ও ট্রেনের মতো সরকারি গণপরিবহণ, বেসরকারি বাস ও ট্যাক্সি ইত্যাদির মতো গণপরিবহণ; এ সবই নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় আওতায় পড়ে।

- ভারতে নগর পরিবহণের ক্ষেত্রে সরকারি গণপরিবহণ ব্যবস্থার অবদান মাত্র ২২ শতাংশ। তুলনায় নিম্ন মাঝারি আয়ের দেশগুলিতে (যেমন কিনা ফিলিপিন্স, ভেনেজুয়েলা, ইজিপ্ট) তা ৪৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদির মতো উচ্চ মাঝারি আয়ের দেশে এই অংশভাক ৪০ শতাংশ।
- ১৯৫১ সাল নাগাদ ভারতে সরকারি গণপরিবহণের অংশভাক ছিল ১১ শতাংশ; আর ২০০১ সালে তা সটাং নেমে ১ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
- ২০০৯ সালের হিসাব বলছে, ভারতে শূন্য দশমিক ৫ মিলিয়ন বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৮৫-টির মধ্যে মাত্র ২০-টি শহরের অভ্যন্তরে সিটি বাস পরিষেবা চালু আছে।
- সড়ক ঘনত্ব (কিলোমিটার প্রতি বর্গ কিলোমিটার পিছু) সিঙ্গাপুরে ৯ দশমিক ২, সিওলে ২১ দশমিক ৮, জোহানেসবার্গে ১০; তুলনায় ভারতের চেন্নাইতে ৩ দশমিক ৮ এবং নয়াদিল্লিতে ১৯ দশমিক ২।

ভারতের শহরাঞ্চলে গণপরিবহণ ব্যবস্থা পরিমাণ ও গুণমান উভয় নিরিখেই অনেক অনেক পিছিয়ে আছে। ফলত না কেবল দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধি সম্ভাবনা ব্যাপক হারে মার খাচ্ছে; মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের উপরও তা প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে। যাতায়াতেই মানুষের দিনের অনেকটা সময় খেয়ে নিচ্ছে। তাছাড়াও শহরাঞ্চলে পরিবহণের সুযোগের সমস্যার তীব্রতার দরুন সড়ক দুর্ঘটনার জীবনহানি, প্রচণ্ড বায়ুদূষণের মতো সঙ্কটের সৃষ্টি হচ্ছে।

নগর পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর দৌলতেই শহরের উৎপাদনশীলতায় সংশ্লিষ্ট শহরের অবদানের ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে সুযোগের পরিসর বাড়ে-কমে। নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় উচ্চ গুণমান বজায় থাকলে তা শহরাঞ্চলের উচ্চ জনঘনত্বের সমস্যা নিরসনে সহায়ক হয়। মানুষজনের যাতায়াত ও পণ্যসামগ্রী চলাচলের পথ সাধ্যায়ত্ত ও সুগম হয়।

পাঁচমিশালি অর্থনীতি সাধারণ ভাবে প্রাথমিক নগর পরিকাঠামোর কতটা কী সুযোগসুবিধা রয়েছে তার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। বিশেষ করে নগর পরিবহণ পরিকাঠামোর উপর। শহরের মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার দৌলতেই মানুষজন তথা বসতি এলাকার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে এমন এলাকার যোগাযোগের পথ সুগম হয়। ফলত নিজের রুচি ও পছন্দ মাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল বেছে নেওয়ার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি হয় শহরবাসীর সামনে।

নগর পরিবহণ ব্যবস্থার পারদর্শিতা ও কার্যকারিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শহরের বসতি এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এই দু'ক্ষেত্রেই। কীভাবে শহর ও পরিবহণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার দেখভাল, রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে অনেকাংশে জড়িত থাকে সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত নিরাপত্তা তথা অপরাধ জগতের কার্যকলাপের হাত থেকে পরিত্রাণের বিষয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুর প্রশ্নে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে যানবাহন থেকে নিঃসৃত দূষণ কণার অবদানই সবচেয়ে বেশি।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে চালিকাশক্তির ভূমিকা নিতে পারে দেশের শহরগুলি। আর সেই শহরবাসীদের এক উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে শহরের পরিবহণ, আবাসন ও বাণিজ্যিক রিয়াল এস্টেটের উত্তরোত্তর চাহিদার বৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয়সাধনের কাজটি সুচারুভাবে করাটা নিতান্তই জরুরি। সরকারি (গণ) পরিবহণ সমেত গোটা নগর পরিবহণ ব্যবস্থাতেই যদি পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার ঘাটতি থেকে যায়, তবে তা একই সাথে অর্থনীতিকে রুগ্ন করে তোলে, পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ হয়, নাগরিক পরিষেবাকে ছন্নছাড়া করে তোলে, সড়ক দুর্ঘটনার কারণে হতাহতের সংখ্যা বাড়ায়, বায়ু ও জল দূষণের তীব্রতা বাড়ায়। সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত নগর পরিবহণ ব্যবস্থা শহরবাসের সুযোগসুবিধাগুলি বাড়িয়ে তোলে অর্থনীতির বৃদ্ধির উপর অনুকূল প্রভাব ফেলে।

ভারতে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই যে নিতান্ত দৈন্যদশা তার জন্য অনেকাংশে দায়ি করারোপ নীতি। যান পিছু প্রতি কিমিতে বেসরকারি যানের তুলনায় সরকারি পরিবহণ যানের উপর মোট করের বোঝা ২ দশমিক ৬ গুণ বেশি। ২০১০ সালে নগরোন্নয়ন (নগর পরিবহণ) সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ভিড়ভাট্টাপূর্ণ/ঘিঞ্জি এলাকায় টোল ট্যাক্সের আকারে ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর "Congestion Tax" আরোপের সুপারিশ করে। কিন্তু নগরোন্নয়ন মন্ত্রক সেই পরামর্শকে বাতিল করে দেয়। মন্ত্রকের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, ভারতীয় প্রেক্ষিতের বিষয়টি মাথায় রাখলে এই মুহূর্তে এই ধরনের কর ধার্য করাটা বড্ডো তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। যত সংখ্যক ও যে মানের সরকারি পরিবহণ রাস্তায় এই মুহূর্তে চালু আছে, তা মাথায় রাখলে তথা "Intelligent Transport System"-এর অনুপস্থিতির কারণেই তা আরও বেশি করে অসম্ভব (লোকসভা, ২০১০)। কিন্তু তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। পরিস্থিতিরও অনেক রদবদল হয়েছে। এটাই "Congestion Tax" আরোপের সঠিক সময়। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে তথা আগামী প্রজন্মের শ্বাস ফেলার জন্য কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়।

আগামী প্রজন্ম, যারা কিনা এই সব সাধ্যায়ত্ত আবাসের বাসিন্দা হবেন, সারা সপ্তাহের সাত দিনের প্রতিটি মিনিট নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ তাদের প্রাথমিক অধিকারের মধ্যে পড়বে। এছাড়াও আশু প্রয়োজন রয়েছে সামাজিক ও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মতো অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার। পার্কিং-এর সুযোগসুবিধা, উন্মুক্ত স্থান, পায়ে চলার পৃথক সড়ক ও বাগিচা, দরকার আছে এসবেরও। কারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্যসম্মত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পূর্ণ অধিকার আছে। আর তার পথ সুগম করে উল্লিখিত নাগরিক পরিষেবাগুলি। এই সব আগামীর নাগরিকরাই তো এক দিন এদেশের সম্পদে পরিণত হবে। ❑

তথ্যসূত্র :

- High Powered Expert Committee (HPEC) Report on Indian Urban Infrastructure and Services, 2011, (Ishar Judge Ahluwalia Committee).
- National Transport Development Policy Committee Report, 2014, Planning Commission, GOI.
- Evolving Perspective in the Development of Indian Infrastructure, Vol II, IDFC, Orient BlackSwan, 2012.
- National Urban Transport Policy, 2006, MoUD, GoI.
- Planning and Designing for Sustainable Urban Mobility, UNHABITAT, 2013.
- Canthia, E. Smith et.al., 'Design with the Other 90% Cities', Smithsonian, Cooper-Hewitt, National Design Museum, New York, 2011.
- Building the Economy Block by Block: Real estate and infrastructure, PWC, 2016.
- Make In India.
- 12th Five Year Plan, Planning Commission.
- The Economic Times
- http://pmayg.nic.in/netiay/English_Book_Final.pdf
- http://pmaymis.gov.in/PDF/HFA_Guidelines/hfa_Guidelines.pdf
- Working Group Report on Migration, 2017, MoHUPA

সুলভ আবাস নির্মাণে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার

যশকুমার শুক্ল

উন্নতমানের ঘরবাড়ি বাসিন্দাদের জীবনের মান বাড়ায় এবং ফলে উৎপাদনশীলতা ও সেই সঙ্গে আয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই, সাধ্যের মধ্যে কুলোয় এমন বাড়ির নকশার লক্ষ্য থাকা উচিত আবাসিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক পরিবেশের দিকে। নকশায় ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল, আরামদায়ক তাপমাত্রা, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি মাপকাঠির কথা খেয়াল রাখা দরকার। সাধ্যায়ত্ত এই ভাবনাটি বাড়ির পুরো আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে, আগেকার শুধুমাত্র প্রারম্ভিক নির্মাণ ব্যয়ের দিকটি হিসেব করার দৃষ্টিভঙ্গি ঝেড়ে ফেলা চাই।

বেড়ে চলা জনসংখ্যা ও তার দোসর উল্কাগতিতে শহরায়ন। এ দুইয়ের সৌজন্যে দেশে আবাস ঘাটতি হয়েছে অনেকখানি। ২০১২-'১৭ সময় পর্বে শহরাঞ্চলে বাড়ির অকুলান ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার। আর গ্রামে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ বাড়ির অভাব (গয়াল, ২০১৪; ন্যাশনাল বিল্ডিং অর্গানাইজেশন, ২০১২)। শহরে বাড়ি ঘাটতির ৯৫ শতাংশ ভুগতে হয় নিম্ন আয়গোষ্ঠী (এলআইজি) ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণির (ইডব্লিউএস) লোকজনকে। ঠিক সেভাবেই, গ্রামাঞ্চলে বাড়ির অভাবের ৯০ শতাংশের বেশি ভোগান্তি গরিবি রেখার নিচের (বিপিএল) বাসিন্দাদের। দেশের নীতি রচয়িতাদের কাছে তাই এসব মানুষের সঙ্গতির মধ্যে বাড়ির ব্যবস্থা করা আশু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক, ২০১৫)।

এলআইজি, ইডব্লিউএস ও বিপিএল মানুষদের কাছে তাদের সাধ্যের মধ্যে বাড়ির জোগান দিতে, গত কয়েক দশকে, ভারত কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও শহরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্তরে বহুবিধ নীতি গ্রহণ করেছে (সরকার, ধাবালিকার, আগরওয়াল ও মরিস, ২০১৬)। হালে, বাড়ির এই টানাটানি ঘোচাতে সরকার হাত দিয়েছে বেশ কয়েকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনায়। সবার জন্য আবাস (শহরাঞ্চল), শহর পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের জন্য অটল মিশন (অম্রুত) ও স্মার্ট সিটি (ভারত সরকারের আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক, ২০১৫; ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক, ২০১৫)-এর অন্যতম। এসব পরিকল্পনায় তৈরি বাড়িগুলি দেশের বর্তমান পরিকাঠামো এবং সম্পদের উপর প্রচণ্ড চাপ দেবে। ২০১৪-'১৫ সালে, ভারতের বসতবাড়িতে খরচ হয়েছে মোট বিদ্যুতের ২৩ শতাংশ (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ২০১৬)। হিসেবমাফিক, ২০৫০ সালের মধ্যে আবাসিক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়বে আট গুণের বেশি (শুক্ল, রাওয়াল ও শ্যাপ, ২০১৪)। সুতরাং, শক্তি, জল ও বস্তুগত সম্পদ কম ব্যবহারকারী বাড়ি বানানোটা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

২০০১ সালে, ভারতে চালু হয় শক্তি সংরক্ষণ আইন। এর ফলে এই প্রথম দেশে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষণ বিধি বলবৎ হয়। এই বিধি সংশোধন করে পরে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে (শক্তি দক্ষতা কার্যালয়, ২০১৭)। জাতীয় আবাস বিধিতে একটা অধ্যায় যোগ করেছে ভারতীয় মানক সংস্থাও (ভারতীয় মানক সংস্থা, ২০১৬)। ঘরবাড়িতে আলো ও গরম জলের প্রয়োজনে সৌরশক্তিচালিত সাজসরঞ্জাম কিনতে মূলধন ভরতুকি দিয়েছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক। গ্রিন রেটিং কর্মসূচি আবাসন কমপ্লেক্সগুলিকে স্বেচ্ছায় শংসাপত্র নিতে উৎসাহ দেয়। এর পাশাপাশি দরকার, কম দামের বাড়িগুলিতে শক্তি-দক্ষ ও গ্রিন বা সবুজ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে সমন্বিত নীতি প্রচেষ্টা।

[লেখক CARBSE, CEPT বিশ্ববিদ্যালয়-এর কারিগরি নির্দেশক (শক্তি ব্যবস্থা)। ই-মেল : yash.shukla@cept.ac.in]

নকশা তত্ত্ব

উন্নতমানের ঘরবাড়ি বাসিন্দাদের জীবনের মান বাড়ায় এবং ফলে উৎপাদনশীলতা ও সেই সঙ্গে আয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই, সাধ্যের মধ্যে কুলোয় এমন বাড়ির নকশার লক্ষ্য থাকা উচিত আবাসিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক পরিবেশের দিকে। নকশায় ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল, আরামদায়ক তাপমাত্রা, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি মাপকাঠির কথা খেয়াল রাখা দরকার। সাধ্যায়ত্ত এই ভাবনাটি বাড়ির পুরো আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে, আগেকার শুধুমাত্র প্রারম্ভিক নির্মাণ ব্যয়ের দিকটি হিসেব করার দৃষ্টিভঙ্গি ঝেড়ে ফেলা চাই। পুরো আয়ুষ্কাল ভিত্তিক ধারণায় নকশার ক্ষেত্রে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠাঁই পায় এবং সাধ্যায়ত্ত বাড়ির বাসিন্দাদের দীর্ঘমেয়াদি উপকারের জন্য বাছা হয় উপযুক্ত প্রযুক্তি। জলবায়ুর সঙ্গে মানানসই নকশা বানাতে হবে। বাড়ি তৈরির কাজে উৎসাহ দিতে হবে স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের জন্য।

নকশার দৃষ্টিভঙ্গি

শক্তি-দক্ষ বাড়ির নকশা তৈরি হয় প্রেসক্রিপটিভ ও পারফরম্যান্স—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনও একটি কাজে লাগিয়ে। প্রেসক্রিপটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাড়ির প্রতিটি উপাদানের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। সম্ভাব্য উপায়গুলির মধ্যে থেকে সবচেয়ে উপযুক্তটি বেছে নিয়ে নকশা ছকে বাড়ি বানোনা হয়। পারফরম্যান্স দৃষ্টিভঙ্গিতে, বাড়ি পারফরম্যান্সের মাপকাঠিতে উত্তরোতে পারে কিনা দেখার জন্য সিমিউলেশন মডেল ব্যবহার করে এক বিশদ শক্তি সিমিউলেশন নিষ্পন্ন করা হয়। সাধ্যায়ত্ত বাড়ির নকশা নির্মাণে প্রেসক্রিপটিভ দৃষ্টিভঙ্গি বেশি উপযোগী।

ভারতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ তাপের সংজ্ঞা

স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক তাপ পেতে, ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ির নকশা হয় টাইট বা ফিক্সড অপারেটিং কনডিশনের জন্য। এক বিস্তারিত গবেষণা, ইন্ডিয়া মডেল ফর আডাপটেটিভ কমফর্ট (IMAC) থেকে দেখা যায় আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বা মানের তুলনায় বেশি তাপমাত্রায় ভারতীয়রা দিব্যি থাকতে পারে (মনু, শুক্ল, রাওয়াল, টমাস ও ডিয়ার, ২০১৬)। সম্প্রতি, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

(NBC) এবং এনার্জি কনজার্ভেশন বিল্ডিং কোড (ECBC)। ২০১৬ নতুন বাড়ির এক নকশা পদ্ধতি হিসেবে IMAC-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাড়ির বাইরের দিকের দক্ষতা

সাধ্যায়ত্ত বাড়ির বহির্ভাগ যেন বাড়ির ভিতরে তাপ ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারে। হাই রিফ্লেকটান্স রুফ (কুল রুফ নামেও পরিচিত), অর্থাৎ রোদের তেজ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম ছাদ বাড়ির গরম থেকে রেহাই পাওয়ার এক ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তি। এছাড়া, দেওয়াল, জানলা তাপ প্রতিরোধক হলে বাড়ির ভিতর গরম কমাবে অনেকখানি।

বাড়ির দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর বা ঘুলঘুলির মতো বাইরের দিকে বসানো সাজসরঞ্জাম থেকে তাপ ঢোকে ঘরের মধ্যে। এসবের মধ্য দিয়ে তাপ কম ঢুকলে ভিতরটায় গরম হবে কম। এসব জায়গার কাছাকাছি কোনও ফুটোফাটা থাকলে অবাঞ্ছিত তাপ বাড়ির মধ্যে ঢোকা বন্ধ করার জন্য তা বুঁজিয়ে ফেলা জরুরি। তাপ ঢোকা কমাতে পারলে ঘরের ভিতরে বাসিন্দারা আরাম পাবে এবং ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য পাখা, এয়ারকণ্ডিশনার ইত্যাদি চালানোর দরকার পড়বে কম। সিলিং বা ছাদের নিচে ফেজ চেঞ্জ মেটিরিয়াল (PCM) দেওয়া টালি ঘরের মধ্যে তাপ কমানোর এক কার্যকর উপায় (শুক্ল ও অন্যান্যরা, ২০১৬)। PCM নিয়ে গবেষণা এখনও হাঁটি হাঁটি পা পা, এই উদ্ভাবনামূলক প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সাধ্যায়ত্ত বাড়ির বাইরের দিকের উপাদানের এক প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে উঠতে পারে।

দরজা-জানলা, ঘুলঘুলির মতো বাইরের দিকে বসানো সাজসরঞ্জামের আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যমান আলোক সংবহন—ভিজিবল লাইট ট্রান্সমিশন (VLT)। দরজা-জানালার মতো সাজসরঞ্জাম মারফৎ ঢোকা দৃশ্যমান আলোর পরিমাপ হচ্ছে VLT। ঘরে দিনের আলো বেশি ঢুকলে বাল্ব জ্বালানোর বিদ্যুৎ খরচ কমবে। ঘরের মধ্যে দিনের আলো ভালো ঢোকানোর ব্যবস্থা করার সময় খেয়াল রাখা দরকার আলো যেন চোখ ধাঁধানো না হয়। স্কাইলাইট বা সূর্যের আলো আসার জন্য বাড়ির ছাদে কাচের ছোটো জানলা বসানোও ঘরের মধ্যে দিনের আলো ঢোকানোর এক ভালো উপায়।

স্থানীয় দ্রব্যের থার্মোফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের দরুন এসব জিনিসের ব্যবহার বাড়তে পারে। সেইসঙ্গে উপযুক্ত নকশার জন্য ডিজাইনারদের কাছে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্যও পৌঁছে দেওয়া যাবে। ডিজাইনাররা ভারতীয় ইমারতি দ্রব্যের থার্মোফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের তথ্যভাণ্ডার অনলাইন পেতে পারেন (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন বিল্ডিং সায়েন্স এন্ড এনার্জি, ২০১৭)।

বহিঃস্থ আলো ও তাপরোধক আচ্ছাদনী

সাধ্যায়ত্ত বাড়িতে জানালা থেকে তাপ ঢোকা কমানোর জন্য বহিঃস্থ আলো ও তাপরোধী আচ্ছাদনী খুব ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি হতে পারে। এই আচ্ছাদনী দু' ধরনের—স্থায়ী (Fixed) এবং নড়ানো চাড়ানো বা

পরিবর্তনযোগ্য (Moveable)। সাবেকি ধাঁচের বাড়িতে সাধারণ স্থায়ী আচ্ছাদনী থাকে। ভারতে পরিবর্তনযোগ্য আচ্ছাদনীর চল শুরু হয়েছে সদ্য সদ্য। এর সুবিধে হচ্ছে, বাড়ির বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজনমাফিক আচ্ছাদনীর অবস্থান পালটে দিতে পারে। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে বহিঃস্থ আলো ও তাপরোধক আচ্ছাদনী জানালা থেকে তাপ ঢোকা ১৫-৩০ শতাংশ কমানোর ক্ষমতা ধরে (কোলার ও অন্যান্য, ২০১৭)। আচ্ছাদনীর নকশা বানানোর যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত তথ্য অনলাইন পাওয়া যায় (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন বিল্ডিং সায়েন্স অ্যান্ড এনার্জি, ২০১৭)।

বায়ু চলাচলের মাধ্যমে চাপ কমানো

বায়ু চলাচল ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়ির মধ্যে বাতাসের গুণমান বজায় রাখা। তবে উন্নত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, পরিবেশ অনুকূল থাকলে বাইরের বাতাসকেও বাড়ি ঠাণ্ডা রাখার কাজে লাগাতে পারে। সাধ্যায়ত্ত বাড়িতে বাসিন্দারা রাতেই বেশি সময় কাটায় বলে বায়ু চলাচল ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘরে তাপ কমানোর পক্ষে এটা বিশেষ কার্যকর। আড়াআড়ি বা ক্রস ভেন্টিলেশনের মতো কলাকৌশল ভারতের ঘরবাড়িতে ১৫-২০ শতাংশ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এবং সম শতাংশ শক্তি বাঁচাতে পারে (ব্যাস এবং আপ্তে, ২০১৭)।

কম শক্তি খরচে ঠাণ্ডা, নবীকরণযোগ্য ও শক্তি খরচে নজরদারির প্রযুক্তি

চরম জলবায়ু এলাকায়, বাসিন্দাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাধ্যায়ত্ত বাড়িতে কম শক্তি খরচে ঠাণ্ডার প্রযুক্তি কাজে লাগানো দরকার। কম শক্তি ব্যয় করে তাপমাত্রা হ্রাস করার এক খরচসাশ্রয়ী প্রযুক্তি হচ্ছে ইভ্যাপরেটিভ কুলিং; অর্থাৎ জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করার মাধ্যমে ঠাণ্ডা রাখা। এর পাশাপাশি, সৌরশক্তি ব্যবহার করে আলো ও জল গরমের বন্দোবস্ত থাকলে সাধ্যায়ত্ত বাড়িতে শক্তি ব্যয় কমবে অনেকখানি। সাধ্যায়ত্ত বাড়িতে শক্তি ভোগ পরিমাপের এক কার্যকর উপায় হচ্ছে শক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বাসিন্দাদের শক্তি খরচ বাঁচায় এবং আগামী দিনে সাধ্যায়ত্ত বাড়ির ডিজাইনের জন্য শক্তির মাপকাঠি সম্পর্কিত দরকারি তথ্য জোগায়।

আগে বলা হয়েছে, শক্তি-দক্ষ ও গ্রিন টেকনোলজি বা সবুজ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যয়সাশ্রয়ী হরেক পদ্ধতি আছে। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বাড়ির একগুচ্ছ লে আউটে অন্তর্ভুক্ত নকশার প্রধান মাপকাঠি, নির্মাণ উপাদান এবং সবুজ প্রযুক্তি থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকায় উপযুক্ত সাধ্যায়ত্ত বাড়ি তৈরি সম্ভব। এতে বাড়ির ডিজাইন তৈরির খরচ কমিয়ে আনুপাতিক সাশ্রয়েরও সুযোগ মেলে। পরিবর্ত হিসেবে, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বাড়ি ব্যয়সাশ্রয়ী ডিজাইন এবং অতি দক্ষ সাধ্যায়ত্ত বাড়ি নির্মাণের পথ করে দেয়। সবুজ প্রযুক্তি-সহ এসব ভালো মানের সাধ্যায়ত্ত বাড়ি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও মঙ্গলে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

Bureau of Energy Efficiency. Energy Conservation Building Code 2017, Ministry of Power Government of India 110 (2017). India.

Bureau of Indian Standards. (2016). *National Building Code of India 2016. New Delhi*, India.

CARBSE. (2017). NZEB—A Living Laboratory. Retriedved February 23, 2017, from http://www.carbse.org/a-living-laboratory/

Center for Advanced Research in Building Science and Energy. (2017). U-factor Tool. Retrieved Agust 14, 2017, from http://www.carbse.org/resource/tools/

Central Statistics Office. (2016). *Energy Statistics 2016. Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.*

Goyal, V. (2014). *Finance Support for Affordable Housing. National Housing Bank.*

Kohler, C., Shukla, Y. & Rawal, R. (2017). Calculating the Effect of External Shading on the Solar Heat Gain Coefficient of Windows. In *IBPSA 2017-International Building Performance Simulation Association* (p. 8).

Manu, S., Shukla, Y., Rawal, R., Thomas, L.E. & Dear, R. De. (2016). Field studies of thermal comfort accross multiple climate zones for the subcontinent : India Model for Adaptive Comfort (IMAC). *Building and Environment, 98,* 55-70. http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.12.019

Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation Government of India. (2015). Pradhan Mantri Awas Yojana-Housing for All (Urban)-Scheme Guidelines 2015, *2017,* 1-62. Retrieved from http://mhupa.gov.in/pmay/repository/01_PMAY_Guidelines_English.pdf

NBO. (2012). *Report of the technical group on urban housing shortage (TG-12) 2012-2017. National Building Organization, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India.* New Delhi, India. Retrieved from http://www.nbo.nic.in/Images/PDF/urban-housing-shortage.pdf

NHB. (2015). Report on Trend and Progress of Housing in India 2015. *National Housing Bank.*

Sarkar, A., Dhavalikar, U., Agrawal, V., & Morris, S. (2016). *Examination of Affordable Housing Policies in India.*

Shukla, Y., Rawal, R., Agrawal, N., Biswas, K., Jain, D., & Sarmah, D. (2016). Influence of Phase Change Material on Thermal Comfort Conditions Inside Buildings in Hot and Dry Climate of India. In *CLIMA : 12th REHV A World Congress.* Aalborg, Denmark.

Shukla, Y., Rawal, R., & Shnapp, S. (2014). Residential Buildings in India : Energy Use Projections and Saving Potentials. In *Gbpn* (Vol. 2030).

Vyas, D., & Apte, M. (2017). Effectiveness of Natural and Mechanical Ventilative Cooling in Residential Building in Hot & Dry and Temperate Climate of India. In *PLEA 2017 Edinburgh* (p. 8).

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে দুর্নীতি রুখতে নতুন আইন

রঞ্জিৎ মেহতা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা। আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিই কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির চাহিদা বাড়াতে পারে, কারণ ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আবাসন একটি প্রিয় বিনিয়োগ মাধ্যম। প্রত্যাশা করা হচ্ছে ২০১৯ সালের শেষাশেষি নাগাদ শহরাঞ্চলে আবাসনের চাহিদা বাড়বে প্রায় দেড় কোটি। কুশম্যান ওয়েকফিল্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মধ্যে চৌত্রিশ লক্ষ আবাসনের চাহিদা আসবে কেবলমাত্র আটটি প্রথম সারির শহর থেকে।

স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কড়া নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করা, লেনদেনে আরও স্বচ্ছতা আনা এবং ভোক্তাদের অধিকারকে আরও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, ২০১৬ সালের ১০ মার্চ একটি বিল পাস করেছে রাজ্যসভা। আইনটির শিরোনাম : স্থাবর সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ২০১৬ বা 'Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA)। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সারা ভারতজুড়েই এই আইন প্রযোজ্য হবে। আইনটি কার্যকর হয়েছে মে ১, ২০১৭ থেকে। আইনটির লক্ষ্য একটি নিয়ন্ত্রক ও বিচার কর্তৃপক্ষ গঠন করে স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং এভাবে স্বচ্ছতা ও ক্রেতাসুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করা।

নতুন এই আইনটি আসার আগে পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতারা উপভোক্তা হিসেবে ১৯৮৬ সালের উপভোক্তা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সুরক্ষা পাবার অধিকারী ছিলেন অথবা প্রয়োজনে তারা দেওয়ানি আদালতে যেতে পারতেন। কিন্তু সব রোগে এক ওষুধ প্রয়োগ করতে গেলে যা হয় তাই হচ্ছিল। স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রের ক্রেতাকে বা সম্ভাব্য ক্রেতাকে উপভোক্তা আইনে সুরক্ষা দিতে যাওয়ায় তাদের দুর্ভোগই কেবল বাড়ছিল, সমস্যার দ্রুত এবং যথাযথ সমাধান, কোনওটাই ঠিকঠাক হচ্ছিল না।

রেরা (RERA)-র প্রয়োজন এবং ভারতের স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রের উপ-বিভাগ চারটি—আবাসন, খুচরো বিক্রয়, আতিথেয়তা এবং বাণিজ্যিক। দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের যত প্রসার ঘটছে এই ক্ষেত্রটিরও তত প্রসার ঘটছে। একদিকে শহরাঞ্চলগুলিতে যেমন ব্যবসার জন্য অফিসের চাহিদা, কর্মীদের জন্য আবাসনের চাহিদা বাড়ছে, তেমনি আধা-শহরগুলিতেও বাড়ছে আবাসনের চাহিদা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা। আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিই কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির চাহিদা বাড়াতে পারে, কারণ ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আবাসন একটি প্রিয় বিনিয়োগ মাধ্যম। প্রত্যাশা করা হচ্ছে ২০১৯ সালের শেষাশেষি নাগাদ শহরাঞ্চলে আবাসনের চাহিদা বাড়বে প্রায় দেড় কোটি। কুশম্যান ওয়েকফিল্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মধ্যে চৌত্রিশ লক্ষ আবাসনের চাহিদা আসবে কেবলমাত্র আটটি প্রথম সারির শহর থেকে। এর মধ্যে আবার ৮.৭২ লক্ষ আবাসনের চাহিদা তৈরি করবে একা দিল্লি রাজধানী অঞ্চল (Delhi NCR)। আটটি শহরে এই চাহিদা বৃদ্ধি ঘটবে মূলত মাঝারি আয় শ্রেণির মানুষের জন্য। মাঝারি আয় গোষ্ঠী বা এমআইজি আবাসনের চাহিদা বাড়বে ৪১ শতাংশ (১৪ লক্ষ)। এমআইজি

[লেখক 'PHD Chamber of Commerce and Industry'-র মুখ্য অধিকর্তা। ই-মেল : ranjeetmehta@gmail.com]

আবাসনের চাহিদার পিছনেই থাকবে নিম্ন আয় গোষ্ঠী বা এলআইজি আবাসনের চাহিদা, যা কিনা ১৩ লক্ষ বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার কর্মসংস্থানের ব্যাপকতা এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষমতার জন্য। এই দ্রুতবৃদ্ধিসম্পন্ন ক্ষেত্রটির জাতীয় আয়ে অবদান ৯.৫ শতাংশের মতো। 'জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম' বা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩-'২২ সালের মধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এই স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রটি।

ভারতীয় স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রটির সঙ্গে আগে-পিছে যুক্ত আছে প্রায় ২৬৫-টি শিল্প। আগে এই ক্ষেত্রটি ছিল বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ক্ষেত্রটি এখন দ্রুত এগোচ্ছে, পাল্লা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলির স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রটির সঙ্গে। পৃথিবীর আর্থনীতিক মানচিত্রে ভারতের অবস্থান যত উজ্জ্বল হচ্ছে, এই ক্ষেত্রটির উপর তার সদর্থক প্রভাব ততই বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ক্ষেত্রটির প্রতি প্রত্যাশা এবং সেই প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রটির দায়িত্বও।

কেন্দ্রীয় সরকার তার 'সবার জন্য আবাস' প্রকল্প, যেটি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নামেও পরিচিত, সেই যোজনার জন্য ৩০৫-টি শহরকে চিহ্নিত করেছে, যেখানে গরিবদের জন্য ২০২২ সালের মধ্যে ২ কোটি ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। গরিবদের ক্রয়সাধ্য এই বাড়িগুলির জন্য নির্ধারিত আইনে ছিল যে, বাড়ির মাপ হবে ৩০-৬০ বর্গমিটার বিল্ট-আপ এরিয়ার হিসেবে। এটিকে বদলে সম্প্রতি করা হয়েছে কার্পেট এরিয়া, যার অর্থ ক্রেতারাও যেমন এর ফলে এই বাড়ির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবেন, আবাসন বিক্রেতারাও তেমনি। আবাসন বিক্রির ক্ষেত্রে বিল্ট-আপের হিসাবটির পরিবর্তে কার্পেট এরিয়ার হিসেবটির ভিত্তিতে বিক্রির নিয়ম চালু করায় ক্রেতারা যেমন একই দামে বড়ো মাপের বাড়ি পাবেন, বিক্রেতারাও তেমনি অধিক সংখ্যায় ক্রেতা পাবেন। গরিবদের আবাসনের ক্ষেত্রে ৩০ বর্গ মিটারের মাপটি প্রযোজ্য হবে কেবলমাত্র চারটি মেট্রোপলিটন শহরে, অন্যান্য শহরের ক্ষেত্রে সেটি হবে ৬০ বর্গমিটার।

যে ৩০৫-টি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ৭৪-টি মধ্যপ্রদেশে, ৪২-টি ওড়িশায়, ৪০-টি রাজস্থানে, ৩৬-টি ছত্তিশগড়ে, ৩০-টি গুজরাতে, ৩৪-টি তেলেঙ্গনায়, ১৯-টি জম্মু ও কাশ্মীরে এবং কেরালা ও ঝাড়খণ্ডে ১৫-টি করে। আর যে সমস্ত রাজ্যগুলি সমঝোতাপত্র বা 'মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং'-এ স্বাক্ষর করেছে তাদের মধ্যে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, উত্তরাখণ্ড। অনুমান করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রটিতে কর্মনিযুক্তির পরিমাণ বর্তমানের ২.৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩.৮ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই সরকার নতুন আইনটি চালু করেছে নীতিহীন প্রোমোটারদের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করতে। আবাসন ক্ষেত্রটির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আইনটি অত্যন্ত জরুরি ছিল। যেহেতু এই ক্ষেত্রটি সরকারি রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, সেহেতু এক্ষেত্রে সরকারের তরফে একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং স্বচ্ছতা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রোমোটারদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। প্রত্যাশা করা যায় রেরা আইনটি ক্রেতাদের প্রত্যাশা বাড়াবে, তাদের নিশ্চিন্ত করবে এবং যারা এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায়, তাদের মনোবলকে চাঙ্গা করবে। আইনটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হল।

রেরার প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. এই আইন বাসস্থান ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত আবাসনকেই নিয়ন্ত্রণ করে।

২. আইনে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে একটি করে স্থাবর সম্পত্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

৩. প্রতিটি আবাসন প্রকল্প ও প্রতিটি জমি-বাড়ির দালালকে এই কর্তৃপক্ষের কাছে বিধিবদ্ধভাবে নথিভুক্ত হতে হবে।

৪. এই আইন অনুযায়ী, প্রতিটি আবাসন প্রকল্পকে নথিভুক্ত হবার পর তাদের প্রকল্পের যাবতীয় খুঁটিনাটি, যেমন— প্রোমোটারের পরিচিতি, লে-আউট প্ল্যান, জমির বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন নির্মাণ সংক্রান্ত অনুমতিপত্র, চুক্তি ছাড়াও দালাল, ঠিকাদার, নকশা সংক্রান্ত ও নির্মাণ সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারদের পরিচয়, সব জানাতে হবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে।

৫. কোনও প্রকল্প স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ছাড়পত্র না পাওয়া এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি নথিভুক্ত না করা পর্যন্ত আগাম বিক্রি (Pre-launch) শুরু করতে পারবে না। প্রতিটি অসমাপ্ত প্রকল্পকেও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অধীনে আসতে হবে।

৬. পাঁচশো বর্গমিটারের বেশি জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা যে কোনও প্রকল্প অথবা যে প্রকল্পে আটটির বেশি (রাজ্যগুলি ইচ্ছে করলে এই নিয়মগুলিকে আরও কমাতে পারে) ফ্ল্যাট থাকবে সেই সমস্ত প্রকল্পই এই আইনের আওতায় আসবে।

৭. বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপনের জন্য উপভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশও জারি হতে পারে কোনও প্রকল্পের উপর।

৮. কোনও নতুন প্রকল্পের অনুমতি চাওয়ার আগে ডেভেলপারকে তার আগের পাঁচ বছরের যাবতীয় সমাপ্ত, অসমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং তাদের বর্তমান হালহকিকৎ সংক্রান্ত বিবরণ জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে এই সব তথ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে, যাতে সম্ভাব্য ক্রেতারা সব কিছু অবহিত হয়ে তবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৯. কার্পেট এরিয়ার উল্লেখ বাধ্যতামূলক।

১০. কোনও প্রকল্পের বুকিং ও অগ্রিম প্রদান বাবদ প্রকল্প নির্মাতা যে অর্থ ক্রেতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন, তার ৭০ শতাংশ ১৫ দিনের মধ্যে কোনও তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্কের একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে, যাতে সে অর্থ কেবলমাত্র প্রকল্পটি

সময়মাফিক সমাপ্ত করতে ব্যবহার করা যায়।

১১. কোনও ব্যাপারে কোনও বিবাদ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে তৈরি হলে বিচার আধিকারিক ও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তার দ্রুত মীমাংসার ব্যবস্থা থাকবে।

১২. স্থাবর সম্পত্তি মামলা, যা এই আইনের আওতায় পড়বে, তা আর কোনও দেওয়ানি আদালত শুনানির জন্য গ্রহণ করতে পারবে না। তবে দেশের ৬৪৪-টি উপভোক্তা আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলতে পারে। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক রাস্তা থাকলে ক্রেতাদের আইনি খরচ কমবে।

১৩. কোনও প্রকল্পের অন্তত দু'-তিনজন ক্রেতার সম্মতি না পেলে নির্মাতা প্রকল্পের প্ল্যান বা ডিজাইন, কিছুই পরিবর্তন করতে পারবেন না।

১৪. যদি কোনও প্রোমোটার তার সম্পত্তি নথিভুক্ত না করেন, তাহলে তাকে প্রকল্পের খরচের ১০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। যদি সে রেরা-র নির্দেশকে অমান্য করে তাহলে তার জরিমানার পরিমাণ আরও ১০ শতাংশ বেড়ে যাবে; পাশাপাশি তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। যদি প্রোমোটার আইনের অন্য কোনও ধারাকে অমান্য করেন, তাহলে জরিমানা হতে পারে প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশ পর্যন্ত। যারা দালাল হিসেবে কাজ করবে তারা আইন অমান্য করার জন্য প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা জরিমানা দেবে, যতদিন অমান্য প্রক্রিয়া চালু থাকবে। এছাড়া দালাল, এমনকি ক্রেতারাও যদি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুন্যালের নির্দেশ অমান্য করে, জেল হবে এক বছরের।

১৫. উপভোক্তা আদালতে যাবার সুযোগটুকু ক্রেতাদের কাছে মস্ত একটি স্বস্তির বিষয়। এর ফলে কম খরচে বিবাদ মীমাংসার সুযোগ থাকবে।

১৬. এই বিলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেরি বা দোষত্রুটির ক্ষেত্রে প্রোমোটার ক্রেতাদের উপর সমহারে সুদ ধার্য করার প্রস্তাব। আগের সংস্থানে এইসব ক্ষেত্রে বিল্ডাররা বাড়তি সুবিধা পেতেন।

১৭. আবাসিকরা যাতে গ্রন্থাগার, কমন হলের মতো সর্বজনীন ব্যবস্থা ও পরিষেবা পরিচালন করতে পারেন, সেই জন্য এই আইনানুযায়ী সম্পত্তি হস্তান্তরের তিন মাসের মধ্যে তাদের নিজস্ব অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক। এর পাশাপাশি, হস্তান্তরের এক বছরের মধ্যে নির্মাণে কোনও রকম কাঠামোগত খুঁত ধরা পড়লে ক্রেতারা ডেভেলপার-এর সঙ্গে বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা (after-sales service)-র জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন।

এই আইন বলবৎ হলে ক্রেতারা অনলাইনেই কোনও নির্মাণ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। নির্মাণকার্যের অগ্রগতির ওপরও তারা নজর রাখতে পারবেন আর প্রয়োজন হলে সময়মতো কাজ শেষ না হলে অভিযোগও জানাতে পারবেন। রাজ্য স্তরে ভূ-সম্পত্তি নিয়ামক সংস্থা স্থাপন আরও সহজ করে তুলবে এই আইন। নিয়ামকের কাছে নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক—এর আওতায় নিবন্ধীকরণ ছাড়া কোনও আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভূ-সম্পত্তিই কেনা-বেচা করা যাবে না। অবশ্য, বাড়ি বা ফ্ল্যাট/আবাসন নির্মাণকারীদের বক্তব্য, একটা প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হলে গোটা ব্যবস্থাটা চলতে হবে নিয়মমাফিক—যেমন, যে কোনও প্রকল্পের জন্যই পুর কর্তৃপক্ষ-সহ একাধিক সরকারি ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক; প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় পরিকাঠামো গড়ে তোলাও জরুরি, ইত্যাদি। তাই তারা চাইছেন যে, সব পক্ষেরই সমান দায়বদ্ধতা থাক।

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞদের মতে এই আইন বলে এই ক্ষেত্রে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছতা আসবে। বিনিয়োগ বাড়বে প্রকল্পগুলিতে। এ পর্যন্ত যে ২৩-টি রাজ্য এই আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সেগুলি হল—উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, অসম, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (নগরোন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি ও হরিয়ানা।

ভারতের অর্থনীতিতে স্থাবরসম্পত্তি ক্ষেত্র (Real Estate Sector)-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জি ডি পি-তে এই ক্ষেত্রের অংশভাক ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিরিখে এর অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও এই ক্ষেত্রটিতে নিয়ামনের অভাব আছে। RERA-র উদ্দেশ্য আইন প্রণয়ন করে এই ক্ষেত্রকে আরও নিয়মানুগ ও স্বচ্ছ বানানো, নির্মাণ সংস্থার দায়বদ্ধতা বাড়ানো আর ক্রেতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে তাকে ঠকার হাত থেকে বাঁচানো।

এর পাশাপাশি, সরকারের "সবার জন্য আবাস"-এর লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে পূরণ করতে হলে বেসরকারি ক্ষেত্রে থেকে বিপুল অর্থের বিনিয়োগ প্রয়োজন। এমনিও ভূ-সম্পত্তি ক্ষেত্র সঙ্কটে। কারণ,সংস্থাগুলি ঋণ জর্জরিত হওয়ার ফলে প্রকল্পগুলির জন্য অর্থের জোগানে টান পড়েছে। তাই এখন এই আইন প্রণয়ন সঠিক দিশায় যথাযথ পদক্ষেপ। ক্রেতা ও সৎ ব্যবসায়ীরা এতে লাভবান হবেন। আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা যায় যে স্বচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতার গুণে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বাজারে আবাসন নির্মাণ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়। এ দেশেও সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল এই বিলটিকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে তাদের মতে, অনুমোদনকারী সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকেও এর আওতায় আনা উচিত; কারণ, প্রকল্পের কাজ সময়মতো এগোনোর ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অপরিহার্য। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের সম্ভাবনা, বলিষ্ঠ অর্থনীতির ওপর ভরসা ও গৃহঋণের সুলভ সুদের হার—এই সব কারণে ক্রেতাদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা যাবে বলে আশা করা যায়। আর সেই উৎসাহই এই ক্ষেত্রকে দেবে নতুন দিশা, জোগাবে নতুন চালিকাশক্তি। ❑

গান্ধীর সেই চরম ঘোষণা

এ. আন্নামালাই

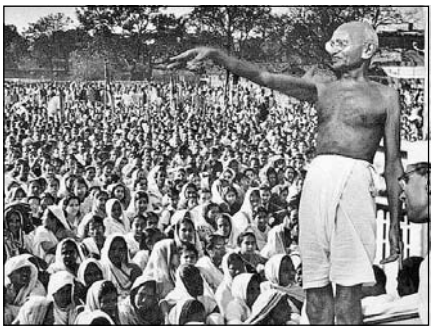

এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী বলেন, "আমার কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই নিজের মালিক। ইতিহাস নিয়ে বহু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অহিংসার পথে এতো বড়ো মাপের পরীক্ষার চালানোর নিদর্শন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আপনারা আর হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবেন না।"

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৩০ জুলাই তার "মন কী বাত" অনুষ্ঠানে আগস্ট মাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে "বিপ্লবের মাস" বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ছেলেবেলা থেকেই আমরা এমনটাই শুনে আসছি। শুনে শুনে এটাই আমাদের কাছে অতি স্বাভাবিক মনে হয়েছে। আর তার কারণ হল, 'অসহযোগ' ও 'ভারত ছাড়ো', দু'টি আন্দোলনেরই সূচনা হয় এই আগস্ট মাসেই। ১৯২০ সালের পয়লা আগস্ট 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়; আর ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন; যাকে কিনা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ 'আগস্ট ক্রান্তি' নামেও উল্লেখ করে থাকেন। আবার ভারতের স্বাধীনতাও এসেছিল এক আগস্টেই, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কাজেই দেখতে গেলে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বহু ঘটনাক্রমের সঙ্গেই আগস্ট মাসের এক নিবিড় যোগ। চলতি বছরে আমরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করতে চলেছি। কিন্তু, এই বহুকথিত 'ভারত ছাড়ো' স্লোগানটি যে ড. ইউসুফ মেহের আলি উদ্ভাবন করেন; সে কথা আমাদের মধ্যে কতজন জানেন? অতি সামান্য সংখ্যক। কাজেই, ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট তারিখে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই জানতে হবে।"

এই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারতের মানুষ, স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় একসাথে এগিয়ে আসেন, একজোট হয়ে লড়াই করেন, একযোগে অত্যাচার সহ্য করেন। ইতিহাসের সেই সব অধ্যায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভারত গড়ে তুলতে আমাদের প্রেরণাস্বরূপ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কেরা একটিমাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'তপস্যা'য় ব্রতী হয়েছিলেন। অত্যাচার সয়েছেন, আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, এমনকী নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এর থেকে বড়ো প্রেরণার উৎস আর কী হতে পারে! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।"

"ভারত ছাড়ো", বলিষ্ঠ এই ঐতিহাসিক স্লোগান-সহ গান্ধীজী ১৯৪২ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন 'করবো অথবা মরবো' অগ্নিমন্ত্রে। বোম্বেতে আগস্ট মাসের ৮ তারিখেই তিনি এই ঐতিহাসিক আহ্বান জানান।

উন্মত্ত হিংসার মাঝে

১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেশের নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই তৎকালীন বড়োলাট (ভাইসরয়) লিনলিথগো, ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ঘোষণা করেন জার্মানির বিরুদ্ধে ভারত যুদ্ধে নামবে। বড়োলাটের ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস। কংগ্রেস কর্মসমিতি বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, দেশে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার গঠন করা হলে এবং যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্য করার কথা ভাবা হবে।

[লেখক নির্দেশক, ন্যাশানাল গান্ধী মিউজিয়াম, নতুন দিল্লি। ই-মেল : nationalgandhimuseum@gmail.com]

ব্রিটিশ সরকার কিন্তু চোখ বুজেই রইল। বড়োলাট লিনলিথগো, কেবলমাত্র উপদেষ্টা পদমর্যাদার একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিলেন। অসন্তুষ্ট কংগ্রেস সদস্যরা ১৯৩৯ সালের ২২ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। এদিকে গান্ধীজী ১৯৩৩ সাল থেকেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মতো নানা গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই পরিস্থিতিই গান্ধীজীকে ফের সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরতে বাধ্য করল।

ব্রিটিশ, যুদ্ধ এবং কংগ্রেস

যুদ্ধের পর নতুন সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে, ব্রিটিশ সরকারের তরফে দেওয়া এই আশ্বাস গান্ধীজী এবং কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কাজেই গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ছিল সীমিত পরিসরে, প্রতীকি এবং অহিংস প্রকৃতির। তাঁর এই সত্যাগ্রহের মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে বলতেন, "এই যুদ্ধে লোকবল বা অর্থ জুগিয়ে, কোনওভাবেই ব্রিটিশকে সাহায্য করা উচিত নয়। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে সমস্ত যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে।" মহাত্মা গান্ধী নিজেই সত্যাগ্রহীদের বেছে নেন। আচার্য বিনোবা ভাবে প্রথম ১৯৪০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর চার মাসের জেল হয়। মোটের উপর প্রায় ১৫ মাস ধরে এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলে।

উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সরকার তখন বেশ বিপাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানিদের আগ্রাসন ঠেকাতে তাদের প্রাণপণ লড়তে হচ্ছে। চার্চিল তাঁর সহকর্মী, লেবার পার্টির স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠালেন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, নিরামিষাশী এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ক্রিপ্‌সকে এই মিশনের জন্য বেছে নেওয়াটা ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত সুচতুর ও বিশেষ কূটনৈতিক চাল ছিল। লোকের মুখে মুখে এই দৌত্যের নাম দাঁড়ায় 'ক্রিপ্‌স মিশন'।

১৯৪২ সালের ২২ মার্চ তারিখে ক্রিপ্‌স দিল্লি পৌঁছান। দেখা করেন গান্ধীজী-সহ কংগ্রেসের তাবড়ো তাবড়ো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। গান্ধীজীর কিন্তু মিশনের প্রতি ততদিনে

চিত্র-১

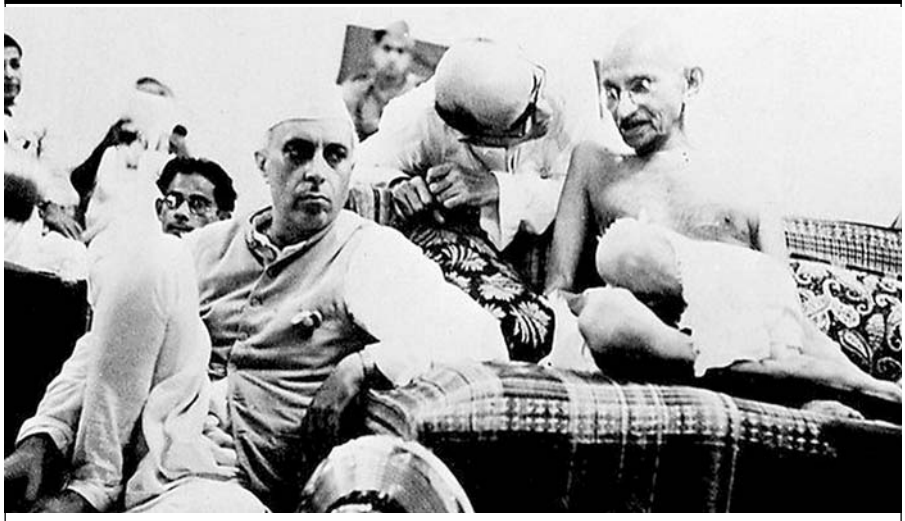

দ্বিতীয় (ব্যক্তিগত) সত্যাগ্রহী ছিলেন নেহরু (১৯৪০)

মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। একে তিনি 'লালবাতি জ্বলা ব্যাংকের পোস্ট ডেটেড চেক' আখ্যা দেন। ক্রিপ্‌সকে তিনি পত্রপাঠ বিলেতে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। ১২ এপ্রিল, শূন্য হাতেই ভারত থেকে ফিরতে হয় ক্রিপ্‌সকে।

বাস্তবসম্মত বিকল্প

মার্কিন লেখক লুইস ফিশার তখন ভারতে। গান্ধীজীর মনোভাব বুঝতে তিনি ওয়ার্ধার সেবাগ্রামে এসে থাকতে শুরু করেন। জিন্না-সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করতে থাকেন। গান্ধীজী সে সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি ফিশারকেই অনুরোধ করেন সে চিঠি নিরাপদে রুজভেল্টের কাছে পৌঁছে দিতে। চিঠিতে গান্ধীজী লেখেন, "আমার প্রস্তাবকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি। আমার পরামর্শ হল, মিত্রশক্তি যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে নিজস্ব খরচে ভারতে সেনা মোতায়েন করতে পারে। তবে, ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নয়, জাপানের আগ্রাসন ও চিনকে ঠেকানোর প্রয়োজনে। আর যদি ভারতের কথা ওঠে, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মতো তাকেও স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিতে হবে। বাইরের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভারতের মানুষ স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করবে। আর যুদ্ধের সময়ে এদেশে সেনা মোতায়েন করতে হলে মিত্রশক্তিকে সেই স্বাধীন সরকারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।"

ব্রিটিশদের অপপ্রচার মেশিনারি, এই সময় পর্বে মার্কিনীদের সামনে গান্ধী, নেহরু ও আজাদ সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে তাদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মকান্ড ও আদর্শকে সমর্থন জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর হয়ে পালটা লবি করার মতো মার্কিন নাগরিকদের একটা গোষ্ঠীও সেই সময়ে আমেরিকায় ছিল।

"ভারত ছাড়ো"

"ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু করার ঠিক একদিন আগে, ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট, গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশদের এদেশ থেকে চিরতরে পাততাড়ি গোটানোর পথ নিতে বলেন। ভারতে ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘটাতে চূড়ান্ত পদক্ষেপ ছিল এই আন্দোলন। সে দিন নিজের বক্তৃতার মাধ্যমে গান্ধীজী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। এবারকার আন্দোলন সংগঠিত করার সময় প্রতিটি ধাপে গান্ধী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে এগোতে থাকেন। প্রস্তাবনা পেশ করার সময়ে গান্ধীজী বলেন, "এই প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদের সামনে দু'-চারটি কথা বলে নিতে চাই। আমি চাই, আপনারা দু'টি বিষয় স্পষ্ট করে বুঝে নিন। এবং আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে তা আপনাদের সামনে পেশ করেছি, আপনারাও বিষয় দু'টিকে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করে দেখুন। অনেকেই আমার কাছে জানতে চাইছেন, ১৯২০ সালের আমি আর আজকের আমি

চিত্র-২

ক্রিপ্‌স মিশন (১৯৪২)

কি ব্যক্তি মানুষ হিসাবে একই রয়েছি, নাকি আমার মধ্যে কোনওরকম পরিবর্তন এসেছে। প্রশ্নটি যারা তুলেছেন, তাঁরাই সঠিক। আমি আপনাদের জানাতে চাই, ১৯২০ সালের আমি আর আজকের আমি ব্যক্তি মানুষ হিসাবে এক। পরিবর্তন বলতে, সেদিনের তুলনায় আজ আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশি বলিষ্ঠ।

অনেক মানুষই মনের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করে চলেছেন। অনেককেই বলতে শুনেছি, তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আম জনতা, ব্রিটিশ সরকার ও সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে তফাত বোঝেন না। তাদের কাছে এরা সমার্থক। অনেকে জাপানিদের আগ্রাসন নিয়ে উদাসীন। জাপানি আগ্রাসন নিয়ে এদের কোনও মাধাব্যথা নেই। তাদের কাছে সম্ভবত এ কেবল শাসকের গদির পরিবর্তনের বেশি কিছু নয়। কিন্তু এরকম চিন্তাধারা বেশ বিপজ্জনক। মন থেকে এই ভাবনা তাড়ানো উচিত আপনাদের।" এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী বলেন, "আমার কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই নিজের মালিক। ইতিহাস নিয়ে বহু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অহিংসার পথে এতো বড়ো মাপের পরীক্ষার চালানোর নিদর্শন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আপনারা আর হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবেন না।"

ভারতের স্বাধীনতা ও স্বশাসন আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের এই সংগ্রাম ছিল নির্ভেজাল অহিংস। হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধে প্রায়শই দেখা যায়, বিজয়ী জেনারেল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের ভাবধারার ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন, "অহিংস বিপ্লবের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়। এ হল, পারস্পরিক সম্পর্কের রূপান্তরসাধনের হাতিয়ার।"

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সেদিন 'করবো অথবা মরবো' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তারা। দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ নিজেদের পড়াশোনা ফেলে, বই-খাতা সরিয়ে রেখে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পথে নেমেছিল। মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ৯ আগস্ট, কিন্তু সেই সময়ে দেশের প্রথম সারির প্রায় সব নেতাকেই ব্রিটিশ সরকার জেলে বন্দি করে রেখেছিল।

দুর্ভাগ্যজনক হিংসা

গান্ধীজীর অহিংস নীতি পরীক্ষার মুখে পড়ে। সরকার সর্বশক্তি দিয়ে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা চালায়। এমনকী, আন্দোলন শুরু হবার আগেই এর মোকাবিলার ছক কষে ফেলেছিল সরকার। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে—এই খবর পাওয়া মাত্র সব প্রাদেশিক গভর্নর, চিফ কমিশনার এবং করদ রাজ্যগুলির পলিটিক্যাল প্রেসিডেন্টদের সেই পরিকল্পনা অনুসারে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমে পড়তে সবুজ সঙ্কেত পাঠানো হয়। গান্ধীজী, কংগ্রেস কর্মসমিতির সব সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটিগুলির সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লিখিত সব কমিটিতেই বেআইনি ঘোষণা করে তাদের দপ্তর ও তহবিল বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার। সশস্ত্রবাহিনী নামিয়ে কড়া হাতে রোখা হয় যাবতীয় বিক্ষোভ, জনসভা, মিছিল। মার্শাল ল-এর আওতায়, কোনও কারণ না দেখিয়েই যাকে খুশি তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরার ক্ষমতা দেওয়া হল স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের।

গান্ধীজীর বক্তৃতার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই, শুধু জাতীয় স্তরের নয়, তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে জেলে ভরা হল। আন্দোলন চলাকালীন পুরো সময়টাই কংগ্রেস নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবকদের কারার অন্তরালেই কাটাতে হয়েছিল। কিছু জায়গায় আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নেয়। উন্মত্ত জনতা সরকারি দপ্তর ভেঙ্গেচুরে গুড়িয়ে দেয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট ধ্বংস করে।

সরকার এর দায় গান্ধীর উপর চাপায়। ভারত থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করতে সুপরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করে উশৃঙ্খল জনতার বিরুদ্ধে সরকারের যথেচ্ছ দমন-পীড়নের সপক্ষে যুক্তি সাজানো হয়। এই দোষারোপ গান্ধীজীকে ব্যথিত করে। গান্ধী যেকোনও বিবাদের মীমাংসায় অহিংসাকেই এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আগাগোড়া প্রয়োগ করে এসেছেন। কিন্তু এই চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেওয়া নিজের দেশের মানুষের আচরণই তাঁকে হতাশ করে তোলে। ফলত, সহযোগীদের সঙ্গে

যেখানে তিনি বন্দি ছিলেন, পুণের সেই আগা খান প্যালেসেই গান্ধী ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত ২১ দিন ধরে অনশন করেন।

হিংসার জবাবে চরম হিংসা

গান্ধীজী তাঁর অনশনের মাধ্যমে যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর কাছে পৌঁছায়। তখন আত্মগোপন করে থাকা এক সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, পরবর্তীকালে গান্ধী স্মারক অছি পরিষদের চেয়ারম্যান আর. আর. দিবাকর, তাঁর সেই সময় পর্বের দ্বিধার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি আগাগোড়া বেশ বুঝতে পারছিলাম, এইসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, এমনকী আত্মগোপন করে থাকাটাও গান্ধীজীর মতাদর্শের পরিপন্থী। আত্মগোপন করে থাকার প্রতি আমার ব্যক্তিগত সায়ও ছিল না। এমনকী এই কাজে আমি খুব একটা দড়ও ছিলাম না, তবুও কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখাতে বাধ্য হয়েই আমাকে তা করতে হচ্ছিল... তবে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস অনিবার্য ছিল, তা আটাকানো না গেলেও কোন ব্যক্তি যাতে হিংসার শিকার না হন, তার ওপর আমাদের কড়া নজর ছিল। কর্মীদের সে কথা মাথায় রাখতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।"

কিন্তু গান্ধীজী জানতেন, হিংসার আগুনে সম্পত্তি ধ্বংস হতে থাকলে আগে হোক বা পরে, তার ছায়া ব্যক্তির ওপর পড়তেও বাধ্য। আন্দোলনকারীরা হোক বা সরকার, কোনও না কোনও পক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিংসা ছড়াবেই। নেতারা আত্মগোপন করে থাকায় এবং কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগের উপায় না থাকায় একবার ব্যক্তিহিংসা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে বাধ্য। কাজেই, ১৯৪৪ সালের ২৮ জুলাই গান্ধী ঘোষণা করেন, অন্তরালে থেকে কার্যকলাপ চালানো হিংসারই সামিল। আত্মগোপনকারী আন্দোলন কর্মীরা প্রকাশ্যে এসে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে কারাবরণ করুক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিংসাত্মক পরিসমাপ্তি

১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট তারিখে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা। যার দরুন লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মিছিলের মধ্যে দিয়ে শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিজয়ী হল মিত্রশক্তি। গ্রেট ব্রিটেন তার দখল করা সব এলাকার উপর অধিকার কায়েম রাখতে সমর্থ হল। এবার তারা বাধ্য হল ভারতের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে। "লবণ সত্যাগ্রহ" ও "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন চলাকালীন ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সরকারের আচার-আচরণ ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতের মধ্যে তো বটেই বাইরের দুনিয়াতেও এক নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করেছিল। অধিকাংশ জনমতই ছিল গান্ধীজী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে।

গান্ধীজী যে অভূতপূর্ব জনজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে ছোটো করে দেখাতে কোনও কোনও মহল থেকে রটানো হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল ব্যয়ভারের জন্যই ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। তা যদি সত্য হ'ত, তাহলে বরং ব্রিটিশরা নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে ভারতকে এক বৃহৎ ঔপনিবেশিক বাজার হিসাবে ব্যবহার করে যেত। প্রচলিত অন্য আরেকটি তত্ত্ব, অন্তর্ঘাতমূলক ও গোপন কাজকর্মের দৌলতে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে, গান্ধী নিজেও খারিজ করে দিয়েছিলেন।

চিত্র-৩

আগা খান প্যালেসে গান্ধী (১৯৪৫)

অসামান্য রাষ্ট্রনায়ক

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করতে দিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। গান্ধীজীর ধারণা ও পূর্বাভাস মতোই ভারতের স্বাধীনতা, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য অনেক উপনিবেশেরও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে রানী এলিজাবেথ বলেছিলেন, অষ্টাদশ শতকে মার্কিন উপনিবেশগুলির দখল ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়েছিল; কারণ, যার উপর অধিকার কায়েম রাখা অসম্ভব, তা ছেড়ে দেওয়ার সঠিক পথ ও সময় নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের মুন্সিয়ানার অভাব ছিল।" গান্ধীজী তাঁর শান্ত অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্রিটিশকে সেই রাষ্ট্রনায়কত্বই শিখিয়েছিলেন। এমন এক নির্ণায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যে ব্রিটিশরা সঠিক সময়ে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ভারত ছাড়তে পেরেছিল।

ভারতের মানুষকে তিনি বলেছিলেন, "করো অথবা মরো।" এক প্রকৃত নেতার মতো মহাত্মা তাঁর কাজ সম্পাদন করার পরই এবং মৃত্যুবরণ করেন। ❑

স্বাধীনতার সত্তর বছর

বাল্মীকি প্রসাদ সিং

ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হল সারা দেশকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে ফেলা। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে রাজণ্যশাসিত ৫৬৫-টি অঞ্চলকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সর্দার প্যাটেল এক্ষেত্রে অনন্য নজির গড়েছেন। ভাঙেনি দেশের ভূখণ্ড। কাজ করে চলেছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপত্র। স্বাধীনতার সময়ে দেশভাগ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি কিংবা ঘরছাড়া হওয়ার বিষয়টি মাথায় রাখলে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি। দেশকে খণ্ডিত করার জন্য চরমপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের সব ছক বানচাল করে দিয়েছে আমাদের দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্র।

সত্তর বছর আগে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন ভারত। বিদেশি শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তি এসেছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্বল করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার নিয়ে সনাতন ভারত সত্তর বছর আগে শুরু করেছিল নিয়তির সঙ্গে নতুন অভিসার। স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক ভারতের এই সত্তর বছরের চালচিত্রকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সমীচীন? মনে রাখতে হবে ৫ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা সমগ্র মানবসমাজের অভিযাত্রার নানা অধ্যায়ের সাক্ষী। অনন্য ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই দেশ। এই প্রেক্ষিতে সমকালীন উন্নয়ন প্রয়াসের অভিঘাত এখানে কীভাবে পড়বে এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে তার সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ বেশ কঠিন। এই কাজ আরও বেশি কঠিন সেই মানুষটির কাছে, যার জন্ম ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারে, এবং যিনি জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রণয়ন এবং রূপায়ণের কাজে যুক্ত। তবুও, এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিচ্ছি যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গৃহীত হয় ভারতের সংবিধান, যা কিনা ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ। গণতন্ত্র এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে গড়ে তোলার দিশারি আমাদের সংবিধান। সেই পথে এগিয়েছি আমরা। এসেছে সাফল্য। তবু, অনেক কাজ এখনও বাকি তা বলাই বাহুল্য। দেশের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে খুঁজে নিতে হবে নিত্যনতুন পন্থা।

সাফল্য

আমাদের সাফল্যের খতিয়ান নেহাত কম নয়। চারটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

● সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে সার্বভৌম দেশ হিসেবে এগিয়েছে ভারত। এখানে শাসনভার ন্যস্ত নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর। লিপিবদ্ধ ইতিহাস বলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সরকার এবং নীতি প্রণয়নকারী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা এই দেশ (এ প্রসঙ্গে প্রাচীনকালে বিহারের বৈশালী এবং বৌদ্ধসঙ্ঘগুলির কথাও মাথায় রাখতে হবে)। আধুনিক ভারত শুধুমাত্র আয়তনের নিরিখেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র নয়, এই গণতন্ত্র সজীব।

এক নাগরিক-এক ভোট এবং প্রত্যেক ভোটের সমান মূল্য—এই বলিষ্ঠ নীতি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল স্তরে তার বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সকলের ভোটাধিকারের সুফল মিলেছে হাতে হাতে। ভারতীয় প্রশাসনের মূল স্তম্ভই হল গণতান্ত্রিক চেতনা।

[লেখক সিকিমের প্রাক্তন রাজ্যপাল। বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদ। সরকারি আধিকারিক হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ছিলেন বিশ্বব্যাঙ্কে কার্যনির্বাহী অধিকর্তা এবং দূত। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং সংস্কৃতি সচিব ছিলেন এক সময়ে। ই-মেল : bpsias@gmail.com]

ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অনেক চিন্তাবিদের বিশেষত পশ্চিমী দুনিয়ার চিন্তাবিদদের, চিরায়ত কিছু ধ্যানধারণার সামনে বড়ো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। ওই সব ধারণা অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাক্ষরতার উচ্চ হার এবং নাগরিকদের ভাষার অভিন্নতা। বলতে গেলে, ভারতীয় গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং বিভিন্নতার মধ্যেই। তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাপনা যে সফল, স্থিতিশীল, প্রাণময় এবং কার্যকরী হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব দেশের নাগরিকদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের। এ কথা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ নির্বাচন হয়ে থাকে, তাতে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকে এবং নির্দিষ্ট প্রথা মেনে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় এক রাজনৈতিক দল বা জোটের থেকে অন্য রাজনৈতিক দল বা জোটের হাতে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ মানুষের সহজে বোধগম্য। সে জন্যই, ভারতীয় ভোটারদের ক্ষমতার প্রতিফলন গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতায় এত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

আরও একটি উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হল এই যে, রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। গ্রাম, শহর সর্বত্রই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, মত বিনিময় এখন আরও বেশি। মানুষ তাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন। তা তারা নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করেন পঞ্চায়েত, বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হল সারা দেশকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে ফেলা। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে রাজণ্যশাসিত ৫৬৫-টি অঞ্চলকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সর্দার প্যাটেল এক্ষেত্রে অনন্য নজির গড়েছেন। ভাঙেনি দেশের ভূখণ্ড। কাজ করে চলেছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপত্র। স্বাধীনতার সময়ে দেশভাগ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি কিংবা ঘরছাড়া হওয়ার বিষয়টি মাথায় রাখলে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি। দেশকে খণ্ডিত করার জন্য চরমপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের সব ছক বানচাল করে দিয়েছে আমাদের দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্র।

● রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রণালীতে। ১৯৪৭-এর পর ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে বিপুল হারে। তা সত্ত্বেও খাদ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এই দেশ। সুপরিকল্পনাপ্রসূত নীতির ফলে খাদ্যের সংস্থান হয়েছে দেশের প্রতিটি মানুষের। দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা নাগরিকদের সুলভ মূল্যে খাদ্য ও কর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে MGNREGA-র মতো প্রকল্প, অভিন্ন বাজার এবং দেশজুড়ে কাজ করা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST চালু হওয়া।

একবিংশ শতকে ভারতকে বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য অর্থনৈতিক শক্তি করে তুলতে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, নীতি প্রণয়নকারী এবং বাণিজ্য জগতের কুশীলবরা সর্বদা নিয়োজিত।

উচ্চ বিকাশ হার, বিদেশি মুদ্রার পর্যাপ্ত সঞ্চয় এবং শেয়ার বাজারের তেজিভাব তাদের নিজেদের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তুলছে। বিকাশ হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের সমবণ্টন ভারতের লক্ষ্য। এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সবসময় যে স্ববিরোধ আছে তেমনটা কিন্তু নয়। কিন্তু, কলেবরে বেড়ে চলা মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জন্য মূল্যবান সম্পদ বেশি ব্যবহৃত হলে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষজনের স্বার্থ অবহেলিত হলে তীব্র সমস্যা ও অস্থিরতা দেখা দিতে বাধ্য।

● সমতার ধারণাকে যথাযথ রূপ দিতে আমাদের সংবিধান দু'ধরনের নীতি নিয়ে চলে। প্রথমত, সকলের জন্য সমান সুযোগ। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাগত ও সামাজিক বঞ্চনার প্রতিকার। সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ প্রথমে ছিল শুধুমাত্র তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য। ১৯৯০ সালে মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার পর এই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তদেরও।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতির একটি সদর্থক দিক হল যে, এতে দলিত এবং পিছিয়ে পড়াদের সামনে সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে যায়। সাধারণভাবে, দরিদ্র এবং প্রান্তিক পরিবারের বাবা-মায়েরা চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অসুবিধায় রয়েছেন। তাদের উপার্জন কম। চাকরির সর্বস্তরে সংরক্ষণের সুবিধা থাকার ফলে এদের সন্তানদের কাছে এখন IAS বা IPS হয়ে ওঠার সুযোগ বেড়েছে। তবে ওই সব গোষ্ঠীর দরিদ্রদের অনেকেই এখনও এই সুযোগ পান না, একথা মানতেই হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার যে সংস্থান সংবিধানে আছে, তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে রাজ্যগুলি মহিলা ও শিশুদের জন্যও এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে। গত সত্তর বছরে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। তবে আরও অনেক কিছু করা বাকি।

আমরা এমন এক সময়ের সাক্ষী, যখন তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংবিধানপ্রদত্ত বিশেষ সংস্থানের উদাহরণ টেনে আরও নানা গোষ্ঠী নিজেদের জন্য ওই ধরনের সুবিধা দাবি করছে। এ জন্য শুধু প্রতিবাদ কর্মসূচি নয়, দেশের অনেক শহরে সহিংস আন্দোলন হতেও দেখেছি আমরা। প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষমতায়নের জন্য সংবিধানে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার পর্যালোচনাও হয়তো জরুরি। দেখতে হবে, যাতে এই বিশেষ সংস্থানগুলির সুবিধা তারাই পেতে পারেন, যাদের কাছে তা প্রকৃতই জরুরি। আসল কথা হল, সংরক্ষণের সুবিধা কতজনের কাছে পৌঁছেছে তার চেয়ে বেশি জরুরি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মধ্যেও যারা প্রান্তিক, তাদের এতে কতটা লাভ হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সব সুযোগ উল্লিখিত জনগোষ্ঠীগুলির কয়েকটি মাত্র পরিবারই ভোগ করে চলেছে বার বার।

● বিচারবিভাগ, নির্বাচন কমিশন, হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত কার্যালয়, সংবাদমাধ্যম—এই সব প্রতিষ্ঠান ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে আরও একটি বড়ো পদক্ষেপ হল তথ্যের অধিকার আইন।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্য এবং স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি কি দেশের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মধ্যে লুকিয়ে আছে? তা কি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের অবদান? না কি আমাদের সংবিধানের জন্য এই অনন্যতা? কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের অবদানের জন্যই কি এটা সম্ভব হয়েছে? আমার মনে হয়, এই সব ক'টি বিষয়ই এখানে কাজ করেছে। বস্তুত, ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা, সহিষ্ণুতার মহান ঐতিহ্য, এ সবই এখানে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

আন্তর্জাতিক আঙ্গিণায় ভারতের উত্থান এ দেশের গণতন্ত্রের অবদানকে কুর্ণিশ জানায়। ভারতের সাফল্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর আধারিত। তবে, এ দেশকে এখনও যেতে হবে অনেক দূর।

বিভিন্ন সমস্যা

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও অবশ্যই রয়েছে। সুনিশ্চিত করতে হবে সকলের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার। জোর দিতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণে। চাই আরও উন্নত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা। দুর্নীতি এবং রাজনীতি জগতের একাংশের দুর্বৃত্তায়ন রোধ করতে হবে নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে।

● **নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার :** রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা।

আইনের অনুশাসন মানতে অরাজি কয়েকটি অশুভ শক্তি ভারতে সক্রিয়। জম্মু ও কাশ্মীরে জেহাদি সন্ত্রাসবাদের রমরমা এবং মাঝে মধ্যেই এ ধরনের মনোভাব অন্য রাজ্যগুলিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা, বেশ চিন্তার কারণ। উত্তর-পূর্বে বিদ্রোহীদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী তৎপর। মূল ভূখণ্ডে নকশালবাদীদের বাড়বাড়ন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আশার কথা এই যে, সাধারণ জনমত জেহাদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং এক্ষেত্রে সরকারের কড়া মনোভাবের পক্ষে সায় রয়েছে সকলের। উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির তৎপরতা এখন নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং অসমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের মোকাবিলা করছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ওই সব রাজ্যের সরকার। তাতে পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। দেশের মধ্যভাগে নকশালবাদীরা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের দরিদ্র মানুষ এবং আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে থাকে। নকশালরা মাওবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং ভারতীয় সংবিধানকে অমান্য করে। তারা বিশ্বাস করে হিংসা এবং বলপূর্বক ক্ষমতার আগ্রাসনে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সুচিন্তিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই উগ্র অতি বামপন্থীদের ডানা ছেঁটে ফেলা সম্ভব হয়েছে। তা নির্মূল করতে প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস। দরকার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকরী নেতৃত্ব।

সকলের জন্য ন্যায়বিচারের প্রথম শর্ত হল নিজের অধিকার সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিকের সুস্পষ্ট সচেতনতা। কোথায় গেলে বিচার মিলবে, তা জানাটাও সমান জরুরি। অনেকেই কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন এখনও। অনেকে সামর্থ্যহীন। আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যয়বহুলতা অনেকের কাছেই বড়ো সমস্যা। ২০১৬ সালের শেষে বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষেরও বেশি। কাজেই, সকলের কাছে বিচার পরিষেবার সুফল পৌঁছে দিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা জরুরি। এর পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজন রয়েছে যাদের, তাদের কাছে সাময়িক ভিত্তিতে আপৎকালীন সহায়তা পৌঁছানোও দরকার।

● **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** গত সত্তর বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার ওপরে তুলে এনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাও, এখনও দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ কোটি রয়েছেন দারিদ্র্য সীমার নিচে। উত্তর ও পূর্বের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা, দেশের প্রতিটি নাগরিককে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কম্পিউটারবন্দি করে ফেলা খুবই জরুরি দরকার। তবেই তাদের কাছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সরাসরি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে মানদণ্ড নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থার নিরিখে এবং ধর্ম, জাতি, রাজ্য, গ্রাম, শহর নির্বিশেষে।

ভারত যদি তার তরুণ-তরুণীদের কাছে উন্নত মানের শিক্ষা এবং দক্ষতার সুযোগ পৌঁছে দিতে পারে, তবে আরও মজবুত হয়ে উঠবে গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি। আজকের যুবাদের সামনে বিশ্বমানের প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া, কিংবা নকশালবাদীদের বা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া—দু'টি বিকল্পই খোলা রয়েছে। দ্বিতীয় বিকল্পটি বন্ধ করে দিতে হবে। সমাজবিরোধীদের আনতে হবে বিচারের আওতায়।

ভারতীয় গণতন্ত্র কি এসব সমস্যা দূর করে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগোতে পারবে? এজন্য প্রয়োজন পরিষেবা প্রদায়ক ব্যবস্থাকে উন্নততর করা, সর্বহারা এবং প্রান্তিক মানুষজনকে নীতি নির্ধারন প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে তাদের বাজারচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুফল গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলা।

● **কর্মসংস্থান :** ভারতের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান। দেশের কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সির সংখ্যা ৮০ কোটি, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। প্রতি মাসে ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণী কাজে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। দ্রুত আর্থিক বিকাশ এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিন্তু বাড়েনি। অনেকে এই অবস্থাকে কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন বলে থাকেন। উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ হতে থাকায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ছে। উত্তর এবং পূর্বের রাজ্যগুলিতে 'যুক্তিগত বিচারে

নিয়োগ অযোগ্য' বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী রয়েছেন। তা সমস্যা আরও বাড়িয়েছে।

নৈব্যক্তিক বিচারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে নেয় জনবিন্যাসের বিষয়টি ভাগ্যনির্ভর। কিন্তু তা বলে বসে থাকলে চলবে না। যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি না করা হয়, তাহলে তাকে সমৃদ্ধি বলা চলে না। জনবিন্যাসে যুবক-যুবতীদের সংখ্যাধিক্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না হলে এই বিষয়টি আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

● **শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য :** যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি, শিশুদের গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শিক্ষা এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্রুত এগোতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের বড়ো দায়িত্ব রয়েছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের সুফল এখনও সাধারণভাবে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলরাই ভোগ করে থাকেন। দরিদ্র মানুষের বসতি এলাকায় থাকা বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বহুলাংশেই সঠিকভাবে পরিচালিত নয়। সেখানকার পরিষেবাও নিম্নমানের।

বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের শিশুরা প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা এবং সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু তাদের উন্নতমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগই সঠিকভাবে চালিত নয়। শিক্ষকদের অনেক পদ সেখানে ফাঁকা। অনেক শিক্ষক স্কুলে আসেন না। ফল যা হওয়ার তাই হয়। এই সব স্কুলের দশ বছর বয়সি অনেক পড়ুয়াই, সাত বছর বয়সিদের উপযোগী লেখাও পড়তে পারে না। অনেক শিক্ষকই যোগ্যতার নিরিখে পিছিয়ে। অন্যদিকে পাঠক্রমের ভার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ ঘটাতে এবং দায়বদ্ধতা বাড়াতে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে জোর দিতে হবে। রাজনৈতিক রঙ দেখলে চলবে না। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির অবস্থা একটু ভালো হলেও তাতে পড়ার খরচ খুব বেশি এবং গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি স্কুল সেভাবে নেই।

একথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকালে উন্নত গুণমানের শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। এর প্রভাবে তৈরি হয়েছে গৌরবময় সভ্যতা, যা বিশ্বের সমীহ আদায় করেছে। বর্তমানে সেই উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হতে হবে। প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে জোর দিতে হবে উদ্ভাবন এবং জ্ঞানের উন্মেষে।

দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টিও উৎসাহব্যঞ্জক নয় এখনও। কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় তো পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অথচ ভারতের সত্তর শতাংশ মানুষের বসবাস এখানেই। শহরে বরং ভালো বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। আছেন ভালো চিকিৎসকও। গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নতি সময়ের দাবি। ওই সব অঞ্চলে উন্নত মানের চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রণালী গড়ে তোলা জরুরি। দক্ষ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যসেবিকার চাহিদা বেড়ে চলেছে। সেদিকে নজর দেওয়া আশু প্রয়োজন।

আশার কথা এই যে, সরকার নতুন শিক্ষা নীতি ও স্বাস্থ্য নীতি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এই নীতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক দিশায় এগোনো জরুরি। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন দেশের সামনে অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ। তা নিয়ে গড়িমড়ি চলবে না। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে নজরদারি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও দরকার।

● **দুর্নীতি এবং রাজনীতি জগতে দুর্বৃত্তায়ন :** রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দুর্বৃত্তায়ন এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ব্যবসায়ীর অশুভ আঁতাত দেশের নীতি নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দুর্বৃত্ত এবং বাহুবলীদের বিভিন্ন বিধানসভা এবং সংসদে প্রবেশ দেশের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভেতর ঘুণ ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মনে হয়, এমন একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে আইনসভার সদস্য হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থকে পুষ্ট করা এবং টাকা রোজগার। আড়ম্বরহীন জীবনযাপন এবং দেশের নিঃস্বার্থ সেবার যে আদর্শ গান্ধীজী দেখিয়ে গিয়েছিলেন তা যেন মুছে ফেলা হচ্ছে। আইনের শাসনের পরিবর্তে কতিপয় ব্যক্তির শাসন চালু করার চেষ্টা চলছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন এবং সংসদ। ওই অশুভ প্রবণতা রোধ করতে কড়া আইনি পদক্ষেপ জরুরি।

ভারতে দুর্নীতির রমরমা সুপ্রশাসন-এর অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দেশের বিকাশের ওপরেও তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। দুর্নীতির মূলে রয়েছে কিছু মানুষের লোভ। দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা মজবুত না হওয়ায় দেশে ঘুষ চালাচালির ঘটনা বাড়ছে। জটিল এবং অস্বচ্ছ নজরদারি ব্যবস্থাপনা, অনুন্নত আইনি পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে গড়িমসি, নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব—এ সবই দেশে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত হওয়ার প্রধান কারণ। এমন একটি প্রণালী গড়ে তুলতে হবে যাতে দোষীরা দ্রুত শাস্তি পায় এবং সৎ নাগরিক, আধিকারিক, উদ্যোগপতি এবং রাজনীতিকদের সম্ভ্রম বজায় থাকে।

সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের দিশা

আগামী দশকগুলিতে ভারত অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে তা নিশ্চিত। অপার সম্ভাবনা আমাদের দেশের সামনে। খেলাধুলো থেকে মহাকাশবিজ্ঞান, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার তৈরি থেকে ওষুধ শিল্প, যোগ—সব দিক দিয়েই এই দেশ নজর কাড়ছে সারা বিশ্বের। তবে, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথ কিন্তু মসৃণ নয়। ভারতের প্রতিবেশ এবং অভ্যন্তরের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে।

বিদেশ নীতির বিষয়ে সাবধানে এগোতে হবে। রাজনীতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও সুযোগের জন্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলির দাবিকে উপেক্ষা করা চলবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও কৌশলগত দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর।

জনবিন্যাস, সংস্কৃতি, মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনা দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে। তার সঙ্গে বাড়ছে মানুষের প্রত্যাশা। ফলে ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে আসা অবশ্যম্ভাবী। দেশের নেতাদের এমনভাবে এগোতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিদেশনীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সমস্যা মোকাবিলার ক্ষমতার সুচারু প্রয়োগের পাশাপাশি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিষয়টিও প্রাধান্য পায়। শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষাসমাজ এবং নীতি নির্ধারকরা সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে তা সম্ভব করতে পারেন। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে চলতে পারে ফলপ্রসূ আলোচনা ও মতবিনিময়।

মহাত্মা গান্ধী চাইতেন আমরা এমন এক ভারত গড়ে তুলতে ব্রতী হই যেখানে দরিদ্রতম মানুষটিও দেশকে নিজের যথার্থ আশ্রয় বলে ভাবতে পারেন এবং দেশ গঠনে নিজের মতামত জানাতে পারেন, যেখান উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই, যেখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন সম্প্রীতির পরিমণ্ডলে।

গণতন্ত্র প্রতিনিয়ত উন্নয়ন এবং প্রশাসনের নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করে চলেছে। বাঁধাধরা কয়েকটি নির্ধারণমাত্রায়, গত সত্তর বছরে আমাদের গণতন্ত্র সুপ্রশাসন এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে।

সর্বাত্মক সমাজ গড়তে চাই ধৈর্য এবং সহনশীলতা। দেশের প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষমতায়নের মধ্যে দিয়ে তাদের আরও কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর পরিকল্পনা, গণপরিবহণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ আবাসন—সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগের। দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী হতে হবে আমাদের। এক্ষেত্রে 'জুগাড়'-এর কথা বলছি না। বলছি আরও কার্যকর কিছুর কথা।

মহাকাশবিজ্ঞান, কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ওষুধপত্র—সব ক্ষেত্রেই ভারত তার উদ্ভাবন ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ISRO এখন পাল্লা দিতে পারে বিশ্বের যে কোনও সমগোত্রীয় সংস্থার সঙ্গে। দেশের শহর ও গ্রামগুলিতে ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান প্রসার উন্নয়নেরই দ্যোতক।

জাতি এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে, সেই সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে উদ্ভাবনক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছি আমরা। ওষুধপত্রের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছে প্রাচীন ভারতের মানুষ। সারা বিশ্বকে যোগের মতো অসাধারণ সম্পদ উপহার দিয়েছে এই দেশ। তর্কবিদ্যা এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার বহু আকর খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের এই ভারতে। এই সব বৌদ্ধিক সম্পদ আজকের কম্পিউটার যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সরকার পরিচালনা, বাজার অর্থনীতি এবং নাগরিক সমাজের কাজকর্মে এখন প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনমূলক প্রয়াসের ছোঁয়া। সমাজ এবং রাজনীতির দুনিয়া দ্রুত ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক বিন্যাস পালটাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি।

উন্নয়ন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া জরুরি। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে আমি বলি বহুধা নীতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক আঙ্গিণায় ভারতকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের অনায়াস বিচরণ সম্ভব হয়েছে এই দেশে।

বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ সমাজের জন্য সারা বিশ্ব ভারতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমাদের কর্তব্য হল, সংখ্যালঘু এবং দুর্বলতর গোষ্ঠীর মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়া। এটা বুঝতে হবে, যে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় সমৃদ্ধ ভারতই পারে দেশের এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করতে।

কোনও সভ্যতার জীবনীশক্তি কতটা প্রবল তা বোঝা যায় বিকাশ ও উন্নয়নের পথে অন্তরায় ধ্যানধারণা ও কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতার নিরিখে। এই পরীক্ষায় আমাদের দেশ উত্তীর্ণ হয়েছে বার বার। ভারতীয় সমাজ যত দিন সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার মূল্য দেবে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস রাখবে, সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ন্যায়বিচারের পথ খোলা রাখবে—ততদিনই তার সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নতুন আঙ্গিকে নিজেকে বার বার মেলে ধরতে সক্ষম হবে।

ইন্ডিয়া বা ভারত তার সন্তানদের আড়ম্বরহীন জীবনযাপন, সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, পরমতসহিষ্ণুতা, আধ্যাত্মিক অন্বেষণ এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার শিক্ষা দিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান এই মূল্যবোধকেই স্বীকৃতি দেয়। কতিপয় মানুষের শাসনের বদলে বলে আইনের শাসনের কথা।

'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'—এই শ্লোগান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা। তা সনাতন ভারতের মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আইনের শাসনের যে অধিকার সংবিধান আমাদের দিয়েছে, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ এই চিন্তাকে পাথেয় করে আগামী ভারত হয়ে উঠবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত এক তুলনাহীন দেশ।

পরিশেষে

লেখা শেষ করি আমার নিজেরই লেখা, "The 21st Century : Geo-Politics, Democracy and Peace (Routledge : New York—London 2017) বইটির একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে।

"আসল প্রশ্ন হল, ভারত কি এগোচ্ছে? সত্যিই কি আমরা অধিকতর সুশাসনের দিকে যাওয়ার পথে? আমি ইতিবাচক উত্তরই দিতে চাই। যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যম, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, সজাগ সংবাদমাধ্যম এবং জীবনীশক্তিতে ভরপুর নাগরিক সমাজ আমাকে আশান্বিত করে। এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়, যখন দেখি দেশের মানুষ, বিশেষত যুবসমাজের দাবি হল এটাই যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠুক।

রাজনীতি, বাণিজ্য জগতের কুশীলবদের এবং সরকারি কর্মীদের এ দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। সরকার, নাগরিক সমাজ এবং বাজার অর্থনীতিকে এগোতে হবে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে। তা তখনই সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন গণতান্ত্রিক ধারা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ মিলেমিশে যাবে একই বহতা স্রোতে।"❑

জানেন কি?

ভারতে সমবায় আবাসন আন্দোলন

দেশে গোটা সমবায় আবাসন আন্দোলনের ক্ষেত্রে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হল ভারতীয় জাতীয় সমবায় আবাসন সংঘ (National Cooperative Housing Federation of India—NCHF)। ১৯৬৯ সালে এই সংস্থার পথ চলা শুরু। তখন থেকেই NCHF সমবায় আবাসনের প্রসার, বিকাশ এবং সমন্বয় কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে। গোটা দেশজুড়ে সমবায় আবাসন গড়ে তোলা ও তার উন্নয়নের লক্ষ্যে NCHF বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। শুরুতে দেশে শীর্ষ সমবায় আবাসন সংঘের সংখ্যা ছিল ছয়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে NCHF এ ধরনের আরও ২০-টি শীর্ষ সংঘ গড়ে তুলেছে। ১৯৬৯-'৭০ সালে NCHF যখন আত্মপ্রকাশ করে গোটা দেশে তখন প্রাথমিক আবাসন সমবায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬,৩০৮। আর তাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১১.১ লক্ষ। আর আজকের দিনে এসে আমরা দেখছি যে, তৃণমূল স্তরে এই প্রাথমিক আবাসন সমবায়ের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সদস্য সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৭০ লক্ষে। এই সব প্রাথমিক আবাসন সমবায়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে NCHF স্বীকৃত/নথিভুক্ত উল্লিখিত ২৬-টি শীর্ষ সমবায় আবাসন সংঘ (Apex Cooperative Housing Federations)। NCHF বিষয়ে এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। দেশে বর্তমানে যত বাড়ি-ঘর তৈরি হচ্ছে তার প্রতি ১০০-টির মধ্যে ১১-টিই সমবায় আবাসনের মাধ্যমে।

সমবায় আবাসন বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? কিছু মানুষ মিলে (এদের সংখ্যাটা সাধারণত গুটিকয়েকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে) নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের প্রয়োজনে একটা সাধারণ আবাসন তৈরি করে বা সেই আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মেনে যৌথ সহায়তার ভিত্তিতে এই ধরনের সমবায় গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের সমবায়ে সদস্যপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা ত্যাগ করা যায়। সমবায়ের কাজকর্ম পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক রীতি মেনে। সমবায় আবাসন গড়ে তুলতে যে পরিমাণ মূলধন বা পুঁজি প্রয়োজন মোটের উপর সদস্যদের তাতে সমান অংশভাক থাকে। সরকার নিযুক্ত সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার (Registrar of Cooperative Societies) বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় আবাসনগুলির কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর জন্য বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় সমিতি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইনকানুন রয়েছে। জাতীয় স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং আন্তঃরাজ্য সমবায় সমিতিগুলি পরিচালিত হয় আন্তঃরাজ্য সমবায় সমিতির জন্য নির্দিষ্ট আইনকানুন অনুযায়ী।

এ ধরনের সমিতির সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম সাত বা তার বেশি হতে হয়। এছাড়াও সমিতিকে সমিতি নথিভুক্তকরণ আইন, ১৮৬০ (Societies Registration Act, 1860)-এর আওতায় নথিভুক্ত হতে হবে। এটি সর্বভারতীয় আইন, যদিও রাজ্য বিশেষে এই আইনের কিছু কিছু তারতম্য রয়েছে। এ ধরনের সমিতি গঠনের পেছনে নির্দিষ্ট সদুদ্দেশ্য থাকে, বৃহত্তর অর্থে জনস্বার্থ অথবা সমিতির সদস্যদের সাধারণ স্বার্থরক্ষা। নথিভুক্ত সমিতি আইনত স্বীকৃত এবং এগুলিকে কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। আবাসন সমবায় গঠিত হয় সদস্যদের আর্থিক স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্যে।

আবাসন সমিতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১। আবাসন সমবায়গুলি লাভজনক সংস্থা নয়। সমিতির নিয়ন্ত্রণ থাকে সদস্যদের হাতে। সুতরাং আর্থিক তছরূপের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

২। সমবায় আবাসনের সঙ্গে সরকারি আবাসনের অন্যতম পার্থক্য হল নকশা নির্বাচন সংক্রান্ত। সরকারি আবাসনের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বা বাড়ির নকশার পরিকল্পনার সময় আবাসিকদের কোনও ভূমিকা থাকে না। বিপরীতে সমবায় আবাসনের ক্ষেত্রে সদস্যরা ঘরবাড়ির মনমতো নকশা বেছে নিতে পারে। এছাড়াও আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সদস্যদের নিজেদের হাতেই থাকায় রক্ষণাবেক্ষণ হয় সুষ্ঠুভাবে আর এই খাতে খরচও হয় কম।

৩। সাধারণত, সমবায় আবাসগুলি গুণগত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের হয়ে থাকে। কারণ, এতে সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি। ফলে সরকারি বা বেসরকারি আবাসনের তুলনায় এক্ষেত্রে আবাসিকদের চাহিদা বা সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বেশি করে নজর দেওয়া হয়।

৪। সমবায় আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধের ঘাটতি থাকে না।

৫। সমবায় আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকল্প-ব্যয় থাকে ন্যূনতম। কারণ, সমবায়ের সদস্যরা নিজেরাই মিলিতভাবে প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়ের দিকটা দেখাশোনা করে।

৬। এক্ষেত্রে সমবায়ই নিজের সদস্যদের জন্য গৃহঋণের ব্যবস্থা করে। ফলে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সদস্যরা সমবেতভাবে দায়বদ্ধ থাকে।

৭। সমবায়ের পরিচালন সমিতিতে অংশগ্রহণ ও ভোটদানের অধিকার থাকে প্রত্যেকটি সদস্যের। ফলে তাদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধ গড়ে ওঠে।

৮। সমবায় নিজেই তার সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা এক ক্ষুদ্র সমাজ বিশেষ। কাজেই, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেমন, বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন, স্বাস্থ্য পরিষেবার বন্দোবস্ত করা, আশপাশের পরিবেশের মানোন্নয়ন, সামাজিক আচার-আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ইত্যাদিতে হাত লাগাতে পারে।

৯। বাসিন্দাদের প্রয়োজনে সমবায় বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও হাতে নিতে পারে, যেমন কিনা ক্রেতা সমবায়, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সমবায় আবাসন সংক্রান্ত যেসব নিয়মবিধি বলবৎ আছে সেগুলির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমবায়ের নিজস্ব নিয়মকানুন মেনে যেকোনও ব্যক্তি বিশেষ আবাসন সমবায়ের সদস্য হতে পারে।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

শ্রমিকদের জন্য সংশোধিত সংহত আবাসন প্রকল্পের নীতিনির্দেশিকা

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক শ্রমিক-কর্মীদের জন্য সংশোধিত সংহত আবাসন প্রকল্পের নীতিনির্দেশিকা বা "Revised Integrated Housing Scheme (RIHS), 2016" প্রকাশ করেছে। শ্রমিক পিছু এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ি তৈরির জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে আবাসন ভরতুকি দেওয়া হবে। মোট তিন কিস্তিতে এই ভরতুকির টাকা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি হস্তান্তরিত করা হবে।

বিড়ি, লৌহ আকরিক খনন, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ও ক্রোমিয়াম আকরিক খনি, চুনাপাথর খনন, ডলোমাইট আকরিক খনি, অভ্র খনি এবং সিনেমা শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীরা যদি শ্রমিক-কল্যাণ সংস্থা (Labour Welfare Organization, LWO)'য় নথিভুক্ত হন, তবে তারা এই সুবিধা পাবেন। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই ভরতুকি দিচ্ছে। ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরের জন্য এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬০ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার তহবিল। চলতি অর্থ বছরে ৮ হাজার বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

অসুরক্ষিত বা বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আবাস সংস্থান

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক আবাসন সংক্রান্ত বিশেষ একটি প্রকল্প রূপায়ণ করছে। সুনির্দিষ্টভাবে বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাস সংস্থানের জন্য হাতে নেওয়া এই প্রকল্পটির পোশাকি নাম, "Scheme for Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups" (PVTGs)। উদ্যোগটি নেওয়ার পিছনে মূল উদ্দেশ্য, এই সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুরোদস্তুর বজায় রেখে এক ব্যাপকতর পন্থা ও অর্থে তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ। বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নিত্যদিনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো গুণগত মানোন্নয়ন ঘটাতে হলে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের যাবতীয় পরিসরের দিকে নজর দিতে হবে। এরই একটা দিক হল, তাদের বসতির উন্নয়ন; সেই উদ্যোগই এবার হাতে নিয়েছে মন্ত্রক। রাজ্যগুলি তাদের বার্ষিক সংরক্ষণ তথা বিকাশ (Annual Conservation-Cum-Development, CCD) পরিকল্পনায় যে প্রস্তাব জমা দেয়, তার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকারের হাতে এই প্রকল্পের বরাদ্দ তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের তরফে পেশ করা এইসব প্রস্তাব আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত "প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি" যাচাই করে দেখে অনুমোদন দেওয়ার পরই তার জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বহুবিধ কর্মকাণ্ড চালানো হয়ে থাকে। (১) জীবিকা; (২) কৃষি, উদ্যানপালন, গবাদি পশুপালন, ডেয়ারি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো; (৩) শিক্ষা (সাক্ষরতা, স্কুল-ছুট, সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের পাশাপাশি আবাসিক বিদ্যালয়); (৪) স্বাস্থ্য (জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ইত্যাদির মতো কর্মসূচি চালিয়েও কার্যকরী স্বাস্থ্য পরিষেবা জোগানোর ক্ষেত্রে যে ফাঁক রয়ে গেছে তা পূরণ); (৫) নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উদ্যোগে এ সংক্রান্ত প্রকল্প রূপায়ণের পরও সর্বত্র/সবাইকে এখনও এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সেই ফাঁক পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে এখানে); (৬) জমি বণ্টন, জমির মানোন্নয়ন; (৭) সামাজিক সুরক্ষা; (৮) আবাস ও বসতি; (৯) যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক ও টেলি-যোগাযোগ); (১০) বিদ্যুৎ সরবরাহ (যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সর্বত্র/সবাইকে এখনও এর আওতায় আনতে পারেনি) এবং রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত-সহ সৌরবিদ্যুৎ; (১১) সেচ ব্যবস্থা (যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সর্বত্র/সবাইকে এখনও এর আওতায় আনতে পারেনি); (১২) নগরোন্নয়ন; (১৩) কৃষ্টি; (১৪) পরম্পরাগত আদিবাসী ক্রীড়া সমেত অন্যান্য খেলাধুলা; (১৫) সুনির্দিষ্ট বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির সর্বাত্মক আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটাতে অন্যান্য যে কোনও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ড।

সুনির্দিষ্ট বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির আবাস নির্মাণের জন্য গৃহীত "আবাস ও বসতি" উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে অর্থসংস্থান করা হচ্ছে ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে। অতিরিক্ত অর্থের জোগান হচ্ছে PVTGs নামক প্রকল্পটির বরাদ্দ থেকে। এই প্রকল্পের অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সময় সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাড়ি তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরম্পরাগত স্থাপত্য নকশা মেনেই যেন তাদের ঘরবাড়িগুলি তৈরি করা হয়। উল্লেখ, PVTGs প্রকল্পের আওতায়, বাড়ি তৈরির জন্য বিগত ২০১৬-'১৭ অর্থ বছরে তামিলনাড়ুর জন্য ৯২৭ দশমিক ৫০ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ❑

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : জাতীয় আন্দোলন

১. কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে সিপাহি বিদ্রোহ হয়?
২. 'বাঁশের কেল্লা' খ্যাত তিতুমীরের আসল নাম কী ছিল?
৩. কোন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেয়?
৪. কোন আইন বলে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'ভারত সচিব' নামে নতুন মন্ত্রীপদ সৃষ্টি করে?
৫. 'সাধারণ জ্ঞানার্জনী সভা' কে স্থাপন করেন?
৬. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় কে ছিলেন ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল?
৭. স্বামী বিবেকানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন?
৮. বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম (মাসিক) পত্রিকা 'দিক্‌দর্শন'-এর সম্পাদক ছিলেন কে?
৯. রায়তদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কত সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব পাস করে?
১০. জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫ সালে) আগে ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল কোনটি?
১১. কোন আইনের দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লোপ করা হয়?
১২. 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ কে করেছিলেন বলে মনে করা হয়?
১৩. 'দ্বিতীয় শিবাজী' বলা হ'ত কাকে?
১৪. কোন গভর্নর জেনারেল জাতীয় কংগ্রেসকে 'ভারতের আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু (microscopic minority) অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান' বলে বর্ণনা করেন?
১৫. কোন অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে?
১৬. বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ফিরোজ শাহ মেহতা—এদের মধ্যে কে চরমপন্থী নেতা ছিলেন না?
১৭. 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি'র প্রবর্তক ছিলেন কে?
১৮. বাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিপ্লবী সমিতি কোনটি?
১৯. 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করতেন কে?
২০. আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে আদালতে সওয়াল করেন কোন ব্যারিস্টার?
২১. 'A Nation is Making' বইটি কার লেখা?
২২. ১৯১৫ সালে কাবুলে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন কে?
২৩. 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টস' নামক সংগঠন কে প্রতিষ্ঠা করেন?
২৪. ভারতে আসার পর কোমাগাতামারু জাহাজের শিখ যাত্রীদের হত্যা ও গ্রেপ্তার করা হয় কোন দিনটিতে?
২৫. কী কারণে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন?

উত্তর :

১. লর্ড ক্যানিং। ২. মীর নাসির আলি। ৩. সুষ্ঠুতর ভারত শাসন আইন, ১৮৫৮। ৪. ভারত শাসন আইন, ১৮৫৮। ৫. তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রামগোপাল ঘোষ। ৬. লর্ড ডাফরিন। ৭. ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। ৮. মার্শম্যান। ৯. ১৮৮৭ সালে। ১০. ভারতসভা (Indian Association)। ১১. ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের চার্টার আইনের দ্বারা। ১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৩. বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ১৪. লর্ড ডাফরিন। ১৫. সুরাট অধিবেশন (১৯০৭ সাল)। ১৬. ফিরোজ শাহ মেহতা। ১৭. বিপিনচন্দ্র পাল। ১৮. অনুশীলন সমিতি। ১৯. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ২০. চিত্তরঞ্জন দাশ। ২১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২. রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। ২৩. মানবেন্দ্রনাথ রায়। ২৪. ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। ২৫. চৌরিচৌরার ঘটনার প্রতিবাদে।❑

WBCS-এ অ্যাকাডেমিকের আবার দুর্দান্ত রেজাল্ট

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত । এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ ।

Souvik Ghosh, Executive (Rank-1) WBCS - 2015

সাফল্যের জন্য দরকার পজিটিভ অ্যাটিটিউড

সর্বদা পজিটিভ চিন্তাভাবনা রাখতে হবে। একটা ন্যানো সেকেন্ডও ভাবা যাবে না যে আমি পারব না। লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব নিয়ে আসতে হবে। দুর্বলতার জায়গাগুলি ইমপ্রুভ করতে হবে। আমার এই সাফল্যের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর অবদান অনস্বীকার্য। শুধু কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পথে চলার ফসল আমার সাফল্য।

Sk. Wasim Reja, WBCS Executive -2016

আমার এই সাফল্যের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস সমুদ্রের মতো। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঠিক গাইডেন্সের ফলে এই বিশাল সিলেবাস আয়ত্ত করতে পেরেছি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য আজ আমি ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে পেরেছি। অ্যাকাডেমিকের স্ট্র্যাটেজী এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি পার্সোনাল অ্যাটেনশনই হল আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।

Pijush Khan, ADSR (Gr.A), (WBCS - 2016)

সাফল্যের একমাত্রে শর্ত হল দৃঢ়চেতা মানসিকতা

শুধুমাত্র পরিশ্রম সাফল্য এনে দিতে পারে না, সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সময় মাফিক রূপায়নই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটা যতটা সহজ ততটা কঠিন। এক্সিকিউটিভে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার। ধৈয্য হারালে চলবে না। গ্রুপ স্টাডি করা যেতে পারে তবে সেটা যেন সর্বনাশ ডেকে না আনে।

Krishanu Roy, WBCS (Executive) -2016

I am very thankful to Academic Association for guiding me to overcome the fear regarding the interview.

First thing first, I owe my success to Almighty God and my parents to give their support, a positive environment and also have faith in me. To crack WBCS the most important thing is to know about the trend and changing pattern of exam.

Md. Jawed, ADSR (Gr.A), WBCS-2015

Read to Learn, Not to Pass Time

একটি ছোট্ট পদক্ষেপে হাজার মাইলের যাত্রা শুরু হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের শুধু সেই ছোট পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে না, বরং তোমার সম্পূর্ণ যাত্রাপথকে সুগম করে দেবে। এই বারই শেষ বার ধরে নিয়ে প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পড়াশুনাকে ভালোবাসতে পারলে সাফল্য আসবেই।

Md. Warshid Khan, CTO (Gr. A) WBCS - 2016

Thanks to Samim Sir for his continuous support

I am proud to be a part of Academic Association. I personally want to give thanks to Samim Sir for his continuous support as a mentor throughout the journey. Thank you Academic Association.

Dr. Dipanjan Jana
Food and Supplies Services (Gr. A), WBCS-2016

থাকতে হবে বীর যোদ্ধার মানসিকতা

আমি মনে করি যে কোন গ্র্যাজুয়েট ছেলে বা মেয়ে ডব্লুবিসিএস পেতে পারে। সিলেবাস দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে, বীরের মত যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকলেই ডব্লুবিসিএস জলভাত । আমি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Arijit Dwari, ADSR (Gr. A), WBCS-2016

WBCS -2018 ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে

Academic Association
53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
9038786000
9674478600
9674478644

জাতীয় ক্রীড়া ও অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার

গত ২২ আগস্ট ঘোষণা করা হয় জাতীয় ক্রীড়া ও অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার বিজয়ীদের নাম। আর ২৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এই দিনটিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এ বছরের রাজীব খেলরত্ন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কার, অর্জুন পুরস্কার, ধ্যানচাঁদ পুরস্কার-সহ জাতীয় ক্রীড়া ও অ্যাডভেঞ্চার সম্মান বিজেতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি মাননীয় রামনাথ কোবিন্দ। উল্লেখ্য, রাজীব খেলরত্ন পুরস্কার ও অর্জুন পুরস্কারের নির্বাচন কমিটির শীর্ষে ছিলেন বিচারপতি সি. কে. ঠক্কর আর দ্রোণাচার্য পুরস্কার ও ধ্যানচাঁদ পুরস্কার প্রাপকদের বাছাই করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন পুল্লেলা গোপীচাঁদ।

- খেলার দুনিয়ায় বিপুল সাফল্য অর্জন করার জন্য **রাজীব খেলরত্ন পুরস্কার** দেওয়া হয়। এ বছর এই সম্মান পেলেন—দেবেন্দ্র (প্যারা-অ্যাথলিট) ও সর্দার সিং (হকি)।
- ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ দেন কোচ। আর যেসব 'গুরু'দের 'শিষ্য'রা আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করে দেশের নাম উজ্জ্বল করে, সেই সব কোচদের দেওয়া হয় **দ্রোণাচার্য সম্মান**। এ বছর এই পুরস্কার বিজয়ী—প্রয়াত ড. আর গান্ধী (অ্যাথলেটিক্স), হীরানন্দ কাটারিয়া (কবাডি), জি. এস. এস. ভি. প্রসাদ (ব্যাডমিন্টন—লাইফটাইম), ব্রিজভূষণ মোহান্তি (বক্সিং—লাইফটাইম), পি. এ. র‍্যাফেল (হকি—লাইফটাইম), সঞ্জয় চক্রবর্তী (শুটিং—লাইফটাইম), রোশনলাল (কুস্তি—লাইফটাইম)।

- খেলার দুনিয়ায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য **অর্জুন পুরস্কার** দেওয়া হয়। পুরস্কার বিজয়ী—তীরন্দাজী : ভি জে সুরেখা; অ্যাথলেটিক্স : খুশবীর কৌর ও আরোকিয়া রাজীব; ক্রিকেট : চেতেশ্বর পূজারা ও হারমানপ্রীত কৌর; ফুটবল : ঐনাম বেমবেম দেবী; গল্‌ফ : এস. এস. পি. চৌরাসিয়া; হকি : এস. ভি. সুনীল; কবাডি : যশবীর সিং; শুটিং : পি. এন. অশোক; টেবিল টেনিস : এ. অমলরাজ; প্যারা-অ্যাথলেটিক্স : বরুণ সিং ভাটি।
- ক্রীড়া জগতে আজীবন অবদানের জন্য **ধ্যানচাঁদ পুরস্কার** দেওয়া হয়। পুরস্কার বিজয়ী—ভূপেন্দ্র সিং (অ্যাথলেটিক্স), সৈয়দ শাহিদ হাকিম (ফুটবল) ও সুমারাই টেটে (হকি)।
- **তেঞ্জিং নোর্গে জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার** পেয়েছেন প্রেমলতা আগরওয়াল (স্থল), মোরে রোহন দত্তাত্রেয় (জল), অশোক অ্যাবে (লাইফটাইম) ও বেদ প্রকাশ শর্মা (লাইফটাইম)।
- **মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ট্রফি** জয় করে পাটিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।
- **'রাষ্ট্রীয় খেল প্রোৎসাহন পুরস্কার'**-এর একাধিক শ্রেণির বিজয়ীরা হলেন—উঠতি প্রতিভার চিহ্নিতকরণ ও পৃষ্ঠপোষকতা : কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন; কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি-র মাধ্যমে ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহদান : ওড়িশা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন; উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া (Sports for Development) : দ্য গল্‌ফ ফাউন্ডেশান ও রিলায়েন্স ফাউন্ডেশান।

যোজনা ডায়েরি

(২১ জুলাই—২০ আগস্ট, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

➢ মুম্বাই জঙ্গি হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের গৃহবন্দি থাকার মেয়াদ আরও দু' মাস বাড়ল। সম্প্রতি এ কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রশাসন। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে গৃহবন্দি রয়েছে জামাত প্রধান। গত এপ্রিলে তাকে গৃহবন্দি রাখার মেয়াদ তিন মাস বাড়ানো হয়। ২৭ জুলাই সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, পর দিন, অর্থাৎ, ২৮ জুলাই ফের দু' মাসের জন্য মেয়াদ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়।

● **বিতস্তা-চন্দ্রভাঘা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে পারে ভারত : বিশ্ব ব্যাঙ্ক :**

সিন্ধুর জলবণ্টন নিয়ে চলতে থাকা টানা-পোড়েনে ধাক্কা খেল পাকিস্তান। জম্মু ও কাশ্মীরে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উপর দু'টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে ভারত। পাকিস্তানের দাবি, সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী ওই দুই নদীর উপর ভারত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারবে না। ভারতকে রুখতে সিন্ধু জল চুক্তির মধ্যস্থতাকারী সংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়েছিল ইসলামাবাদ। বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়ে দেয়, বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার উপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার অধিকার ভারতের রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৬০ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিন্ধু এবং তার পাঁচ উপনদী বিতস্তা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু ভারত থেকে পাকিস্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির জলের ভাগাভাগি সুনির্দিষ্ট করতেই বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ওই চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার জলের উপর পাকিস্তানের অধিকার বেশি। আর ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রুর উপর ভারতের অধিকার বেশি। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার উপর ভারত দু'টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু করে। ৩৩০ মেগাওয়াটের কিষাণগঙ্গা এবং ৮৫০ মেগাওয়াটের রতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে পাকিস্তানের ঘোর আপত্তি রয়েছে। ভারত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির নামে পাকিস্তানের পাওনা জল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে ইসলামাবাদের দাবি। ওই প্রকল্প দু'টির কাজ আটকাতে ইসলামাবাদ তাই বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু পয়লা আগস্ট একটি 'ফ্যাক্ট শিট' প্রকাশ করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, সিন্ধু এবং তার উপনদীগুলির উপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির অধিকার ভারতের রয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পর্যবেক্ষণ ওই তিন নদনদীর জল ভারত যেসব কাজে ব্যবহার করতে পারবে বলে চুক্তিতে লেখা রয়েছে, তার মধ্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার কথাও আছে। জলের প্রবাহ না আটকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনও বাধা নেই বলে বক্তব্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের। ফ্যাক্ট শিট-এ আরও বলা হয়েছে, যে দু'টি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে, তার প্রকৌশলগত বিষয় নিয়ে দু' দেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যে, প্রকৌশল বা প্রযুক্তিতে ওই দুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে, তাতে জলের প্রবাহ আটকে যাবে বলে পাকিস্তানের দাবি। কিন্তু ভারত বলছে, জল কোনওভাবেই আটকাবে না। এ বিষয়ে সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান আবার আলোচনায় বসবে বলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছে। তবে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা স্পষ্ট জানিয়েছে, সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী ওই দুই নদীর উপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির অধিকার ভারতের রয়েছে।

● **উত্তর কোরিয়ার উপর রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন নিষেধাজ্ঞা :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব ভঙ্গ এবং পর পর আন্তঃদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) পরীক্ষা করার অভিযোগে গত ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর কোরিয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন করে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাণিজ্য সংক্রান্ত এই নিষেধাজ্ঞার পর এবার উত্তর কোরিয়ার পাশে দাঁড়ায়নি 'বন্ধু' চিনও। যে বেজিংকে এত দিন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রস্তাবে 'ভেটো' দিতে দেখা গিয়েছে, সেই চিনও এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষেই ভোট দিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেই গত ২ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সই করেন উত্তর কোরিয়ার উপরে আমেরিকার প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞায়।

● **বেজিংয়ের ভেটো, আরও তিন মাস রেহাই মাসুদের :**

পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারকে রাষ্ট্রপুঞ্জের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ভেটো দিয়ে আরও তিন মাসের জন্য আটকে দিল বেজিং। এর আগে মার্চেও চিন এই কাজ করে বলেছিল—মাসুদ জঙ্গি কি না সে বিষয়ে একাধিক মতামত রয়েছে। ভারত মাসুদকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য কূটনৈতিক দৌত্য চালিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য দেশের অন্যতম চিন। এপ্রিলে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সে দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইয়াং জিয়েচির সঙ্গেও মাসুদ আজহারের প্রসঙ্গে কথা বলেন।

মাসুদ প্রশ্নে আমেরিকা-সহ বাকি ৪ স্থায়ী সদস্য দেশ কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিন মাস আগে এই প্রসঙ্গে বেজিংয়ের বিরুদ্ধে স্বর চড়িয়েছিল আমেরিকাও। এই বছর রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি নিকি হ্যালি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই প্রসঙ্গে তিনি এই ইঙ্গিত করেন।

● **রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা :**

গত ২ আগস্ট হোয়াইট হাউসের এক অফিসার জানান, রাশিয়ার উপরে নয়া নিষেধাজ্ঞায় সই করেছেন ট্রাম্প। এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে বিল পাস হয়েছিল হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ। সেখানে নিষেধের পক্ষে ৪১৯-টি ভোট পড়ে। সেনেটেও সমর্থন পেয়ে নিষেধ-প্রস্তাব পৌঁছায় ট্রাম্পের টেবিলে। ২০১৬-র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ, ক্রিমিয়ায় রুশ দখলদারি এবং সিরিয়ায় রুশ আগ্রাসন—মূলত এই সব কারণে নতুন করে মস্কোর উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। রাশিয়া ছাড়াও অন্য কারণে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখা হয়েছে উত্তর কোরিয়া এবং ইরানকে।

আমেরিকার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পরই কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে ক্রেমলিনের তরফে। এর পরের মাস থেকেই মস্কোয় কর্মরত মার্কিন কূটনীতিক ছাঁটাইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুতিন প্রশাসন। এই নিষেধের প্রভাব পড়বে রুশ প্রতিরক্ষা এবং শক্তিক্ষেত্রে। অন্যদিকে, রাশিয়ার উপরে নয়া নিষেধাজ্ঞা চাপানোর প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে গত ২৫ জুলাই বিল হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ পাস হওয়ায় মোটেই খুশি নয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-ও। দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ইইউ-এর হুঁশিয়ারি, এই নিষেধাজ্ঞায় ইউরোপের উপরে তেমন প্রভাব পড়বে না—দ্রুত এমন আশ্বাস না পেলেও তারাও পালটা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

● **ভোটে জয়ী মাদুরো, ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা :**

গত ৩০ জুলাই বিশেষ সংবিধানসভা নির্বাচনে তিনিই বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। যদিও সে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভোটের বিরোধী ছিলেন। তাদের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই ভোটে গিয়েছেন মাদুরো। ৩১ জুলাই ফল ঘোষণার পরেও সেই প্রতিবাদ অক্ষুণ্ণ। তার জেরে চাঞ্চল্য আন্তর্জাতিক মহলেও। পূর্ব ঘোষণা মতোই মাদুরোকে 'একনায়ক' আখ্যা দিয়ে খনিজ তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলার উপরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে আমেরিকা।

ভোটে জয়ের ফলে মাদুরো জাতীয় আইনসভা ভেঙে দিয়ে নিজের মনোনীত ৫৪৫ সদস্যকে নিয়ে নতুন সংবিধানসভা গড়তে পারবেন। বিরোধীদের মতে, সংবিধান বদল করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে হাঁটতে চাইছেন মাদুরো। অন্য দিকে, উগো চাভেস-এর এই উত্তরসূরির নিজের দাবি, নয়া সংবিধান দেশে শান্তি আনবে। আমেরিকা গোড়া থেকেই বলে আসছিল, এই ভোট তারা মানবে না। কানাডা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, কলম্বিয়াও এই ভোট মানছে না। তবে নিকারাগুয়া এবং বলিভিয়া মাদুরোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

● **পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খকন আব্বাসি :**

পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হলেন শাহিদ খকন আব্বাসি। গত পয়লা আগস্ট ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে ভোটাভুটিতে বড়ো ব্যবধানে জিতলেন তিনি। পাক পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মোট ৩৪২-টি ভোটের মধ্যে ২২১-টি ভোটই পান আব্বাসি। আব্বাসির পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র প্রার্থী নাভিদ কমর পেয়েছেন ৪৭-টি ভোট। অন্য দিকে, ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফের শেখ রশিদ আহমেদ ৩৩-টি ভোট পান। কেবলমাত্র ৪-টি ভোট মিলেছে জামাত-ই-ইসলামি দলের সাহেবজাদা তারিকুল্লার।

এর পর গত ৪ আগস্ট শপথ নিয়েছে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খকন আব্বাসির নয়া মন্ত্রিসভা। মোট ৪৭ জন সদস্যের এই নয়া মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী ২৮ জন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯ জন। অবশেষে পাক মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হল এক হিন্দু মন্ত্রীর—বছর পঁয়ষট্টির দর্শন লাল। এরই সঙ্গে প্রায় চার বছর পরে কোনও বিদেশমন্ত্রী পেল পাকিস্তান। নয়া মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন খাজা মহম্মদ আসিফা। তিনি নওয়াজ শরিফের মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন। দেশের শেষ বিদেশমন্ত্রী ছিলেন হিনা রব্বানি খার। ২০১৩ সালে শপথ নেওয়া নওয়াজ শরিফের মন্ত্রিসভায় কোনও বিদেশমন্ত্রী ছিল না। শপথ নেওয়া নতুন মন্ত্রিসভায় অনেকেই শরিফের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

প্রসঙ্গত, পানামা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকায় গত ২৮ জুলাই নওয়াজ শরিফকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। তার জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আব্বাসির নাম ঘোষণা করে তার দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)। নওয়াজের পর তার ভাই পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা এক রকম নিশ্চিত। তবে তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি-র নির্বাচিত সদস্য নন। ফলে ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত আগামী ৪৫ দিন ক্ষমতায় থাকবেন আব্বাসিই।

● **পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন পদক্ষেপ :**

জঙ্গি দমনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করায় পাকিস্তানকে দেওয়া পঁয়ত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিল আমেরিকা। যার গোটাটাই প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জেমস ম্যাটিস ২১ জুলাই মার্কিন কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র অ্যাডাম স্টাম্প সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, হক্কানি নেটওয়ার্কের মতো একাধিক জঙ্গি সংগঠন দমনে কোনও রকম পদক্ষেপই করেনি পাকিস্তান। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

● **হিজবুলকে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন', ঘোষণা আমেরিকার :**

কাশ্মীরের পাক মদতপুষ্ট শক্তি হিজবুল মুজাহিদিনকে 'বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' বলে ঘোষণা করল আমেরিকা। গত ১৬ আগস্ট মার্কিন বিদেশ দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সে দেশের অভিবাসন এবং জাতীয়তা আইনে হিজবুলকে এই তকমা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৯-এ হিজবুল মুজাহিদিন গঠনের পর থেকেই কাশ্মীরে লাগাতার জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে এই সংগঠন। হিজবুলের হয়ে অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছে ওই সংগঠনের প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন।

মহম্মদ ইউসুফ শাহ নামেও পরিচিত সালাউদ্দিনকে গত জুনেই 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়েছিল ট্রাম্প সরকার।

জাতীয়

● **মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আধার 'প্রয়োজন' :**

গত ৪ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, পয়লা অক্টোবর থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে গেলে মৃত ব্যক্তির আধার নম্বর জমা দেওয়া প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা রেজিস্ট্রার জেনারেল ইন্ডিয়া (আরজিআই) এই নোটিস জারি করেছে। নোটিসে অবশ্য 'বাধ্যতামূলক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বলা হয়েছে, পয়লা অক্টোবর থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে মৃত ব্যক্তির আধার নম্বর জমা দেওয়ার 'প্রয়োজন' আছে। আর মৃত ব্যক্তির যদি আধার কার্ড না থাকে বা মৃত ব্যক্তির যে আত্মীয় মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আবেদন করছেন, তিনি যদি মৃতের আধার নম্বর না জানেন; আরজিআই-এর নোটিসে বলা হয়েছে, এই সব 'ব্যতিক্রমী' ক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তিকে হলফনামা দিয়ে বলতে হবে যে, মৃত ব্যক্তির আধার কার্ড ছিল না বলেই তিনি জানেন। যদি কোনওভাবে প্রমাণিত হয় যে, হলফনামায় তিনি মিথ্যা বলছেন, তাহলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'আইনানুগ ব্যবস্থা' নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে নোটিসে।

আরজিআই-এর দাবি, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে মৃত্যুর শংসাপত্র আদায় করার ঘটনা আকছার ঘটে। এই ধরনের অসাধু কার্যকলাপ রুখতেই এই পদক্ষেপ। তাছাড়া, এখন থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে শুধু আধার নম্বর দিলেই হবে। মৃতের পরিচয়পত্র হিসেবে একাধিক নথি দাখিলের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর শংসাপত্রে আধার নম্বর যাতে ঠিকমতো নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকে, পয়লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা দেখতে হবে তাদের। প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর (পিআইবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম ও মেঘালয় ছাড়া দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে এই নিয়ম বলবৎ করা হচ্ছে পয়লা অক্টোবর থেকে। বাকি তিনটি রাজ্যে কবে থেকে এই নিয়ম চালু হবে, তা জানানো হবে পরে।

● **রেল টিকিটে নাম বদল সহজেই :**

দূরপাল্লার ট্রেনে টিকিট কেটে কোনও ব্যক্তি সফর করতে না পারলে এবার থেকে তার বদলে পরিবারের কেউ সেই টিকিটে ভ্রমণ করতে পারবেন। তবে ট্রেন ছাড়ার অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে সংরক্ষিত টিকিটটি আসন সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রমাণপত্র দেখিয়ে নামটি বদল করে নিতে হবে। এই সুযোগ আগেও ছিল। কিন্তু নিয়ম এতই এতই কড়া ছিল যে, সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত নাকাল হতেন। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিকিট বাতিল করে দিতেন যাত্রীরা। এবার নিয়ম অনেক সহজ করে দিয়েছে রেলমন্ত্রক।

● **তৎকালে বুক করা রেল টিকিটের দাম পরে মেটানোর ব্যবস্থা :**

এবার থেকে টাকা না দিয়েই তৎকালে টিকিট বুক করতে পারবেন যাত্রীরা। গত ২ আগস্ট এমনই ঘোষণা করেছে রেলের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)। আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে গিয়ে তৎকালে টিকিট কাটলে এই সুবিধা পাবেন যাত্রীরা। এতদিন পর্যন্ত কেবল জেনারেল রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে এই পরিষেবা পেতেন যাত্রীরা। এই নয়া পরিষেবায় প্রথমে irctc.payondelivery. co.in ওয়েবসাইটে গিয়ে আইআরটিসি ইউজার নেম, ই-মেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় আধার বা প্যান নম্বর দিতে হবে। আইআরসিটিসি পোর্টালের 'পে অন ডেলিভারি' অপশনে গিয়ে ক্লিক করে 'ডেলিভারি অ্যাডরেস' সিলেক্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে এসএমএস, বাইমেল পৌঁছে যাবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকিট পৌঁছে যাবে বাড়ির দরজায়। হাতে টিকিট পেয়ে নগদে বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে।

● **সেনাবাহিনীর জন্য রিমোট চালিত ট্যাংক 'মন্ত্র' :**

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে প্রথম প্রকাশ্যে আনা হয় সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি রিমোট চালিত ট্যাংক 'মন্ত্র'। মূল লক্ষ্য নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করা। সেই উদ্দেশ্যে এবার সেনাবাহিনীতে হাতে আসতে চলেছে চালকবিহীন, রিমোট চালিত ওই ট্যাংক। নজরদারি চালানো ছাড়াও মাইন পোঁতা থাকলে তারও দলিশ দেবে মন্ত্র। পাশাপাশি, পারমাণবিক ও জৈব অস্ত্র হামলার আশঙ্কা রয়েছে, এমন এলাকাতেও ব্যবহার করা যাবে। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর চেন্নাইয়ের ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়েছে এটি। সামান্য কিছু পরিবর্তনের পর তুলে দেওয়া হবে সেনাবাহিনীর হাতে।

ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান এস. ক্রিস্টোফার জানিয়েছেন, তিনটি ভিন্ন মডেল তৈরি করা হয়েছে এই ট্যাংকের। নামে দেওয়া হয়েছে— 'মন্ত্র এম', 'মন্ত্র এন' এবং 'মন্ত্র এস'। নজরদারি চালানোর কাজে ব্যবহার করা হবে 'মন্ত্র এস'। মাইন পোঁতা আছে কি না তা খুঁজবে 'মন্ত্র এম'। পাশাপাশি, পারমাণবিক এবং জৈব অস্ত্র হামলার সম্ভাবনা রয়েছে এমন জায়গায় কাজে লাগানো হবে 'মন্ত্র এন'-কে। 'মন্ত্র'-তে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা, র‍্যাডার, যা ১৫ কিলোমিটার দূরে লুকিয়ে থাকা কোনও বস্তুর ছবিও সহজেই তুলতে পারবে। রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে 'মন্ত্র'-র কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। মরুভূমির প্রায় ৫২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও কাজ করতে সক্ষম এই আধুনিক ট্যাংক।

● **পাসপোর্টের জন্য আর বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে না :**

এবার থেকে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে আর বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে না। আধার, প্যানের মতো প্রমাণপত্র দিলেই চলবে। পাসপোর্ট ইস্যুকে আরও সহজ করতে এমনই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি বাদল অধিবেশনে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের রঞ্জীব বিসওয়ালের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি. কে. সিংহ জানান, এবার থেকে পাসপোর্ট আবেদনে আধার, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি এমনকী এলআইসি পলিসিও জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। সরকারি কর্মচারীরা তাদের চাকরি, পেনশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজও পাসপোর্ট তৈরির নথি হিসাবে জমা করতে পারেন। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ থাকলে সেই ডকুমেন্টও প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট নিয়ম অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালের ২৬ জানুয়ারি এবং তার পরে যাদের জন্ম তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট নিয়ম অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালের ২৬ জানুয়ারি এবং তার পরে যাদের জন্ম তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট আবেদনে বার্থ সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকা অথবা শংসাপত্রই না থাকার কারণে পাসপোর্ট তৈরিতে জটিলতা বাড়ছিল। সম্প্রতি এক সরকারি রিপোর্টে জানা গিয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫.১৫ শতাংশ মানুষের পাসপোর্ট রয়েছে।

● **দেশজুড়ে ৮১ লক্ষ আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হল :**

দেশজুড়ে প্রায় ৮১ লক্ষ আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। আধার কার্ড বাতিল সংক্রান্ত এই তথ্য গত ১১ আগস্ট রাজ্যসভায় জানান কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী পি.পি. চৌধুরী। সঠিক তথ্য না দেওয়ার কারণেই এই সব আধার বাতিল করা হয়েছে। আধার কার্ড বাতিল বা নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রয়েছে ইউআইডিএআই-এর হাতে। আধার কার্ড রেগুলেশনের ২৭ এবং ২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনওভাবে একই ব্যক্তির নামে দু'টি পৃথক আধার কার্ড জারি করা হলে বা তাতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে, কার্ড বাতিল বা নিষ্ক্রিয় করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বায়োমেট্রিক তথ্যে ভুল থাকলেও আধার নিষ্ক্রিয় করা হয়। নিয়মানুসারে, পাঁচ বছরের কম বয়সি কোনও শিশুর নামে আধার কার্ড থাকলে, পাঁচ বছর বয়সের পরে তার বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট করতে হবে। ফের ১৫ বছর বয়স হওয়ার পর আবার ওই তথ্য পুনরায় দিতে হবে। তথ্য আপডেটের জন্য দু' বছরের সময়সীমা দেওয়া হয়। এই দু' বছরের মধ্যে আপডেট না হলে, আধার কার্ডটি বাতিল করা হয়। আধার কার্ড সচল রয়েছে কী না জানতে প্রথমে ইউআইডিএআই-এর ওয়েবসাইটের হোমপেজ-এ গিয়ে আধার সার্ভিস ট্যাবের 'ভেরিফাই আধার নম্বর' অপশনে ক্লিক করলে নতুন একটি পেজ খুলবে। সেখানে নিজের আধার নম্বর লিখে সিকিউরিটি কোড দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। যদি সবুজ রাইট চিহ্ন আসে তাহলে আধার কার্ড অ্যাক্টিভ রয়েছে। আর তা না হলে বুঝতে হবে কার্ডটি ইন-অ্যাক্টিভ। আধার কার্ড ইন-অ্যাক্টিভ থাকলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে এনরোলমেন্ট সেন্টারে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। সেন্টার থেকে নতুন আধার আপডেট ফর্ম দেওয়া হবে। একই সঙ্গে নেওয়া হবে বায়োমেট্রিক তথ্য। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ২৫ টাকা এবং মোবাইল নম্বর দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া অনলাইন বা ডাক যোগে হবে না। বায়োমেট্রিক তথ্য দিতে হবে বলে ব্যক্তিগতভাবেই সেন্টারে হাজিরা দিয়ে তথ্য এনরোল করাতে হবে। সেন্টারের আধিকারিকেরা আগের এবং বর্তমানের বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করে দেখে নেবেন।

● **আগামী বছর থেকে আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষা অনলাইনে :**

এবার থেকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা আইআইটি-তে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে। প্রার্থীরা নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে কম্পিউটারে পরীক্ষা দেবে। আগামী বছর থেকেই পদ্ধতি কার্যকর করা হবে। গত ২০ আগস্ট জয়েন্ট অ্যাডমিশন বোর্ডের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এ বছর শেষবারের মতো অপটিক্যাল মার্ক রিডিং বা ওএমআর শিটে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিয়েছে। অবশ্য, অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো দরকার। সেজন্যই আগামী বছর থেকে নয়া পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক আগেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেন পরীক্ষা অনলাইনে চালু করার কথা ঘোষণা করেছিল। এবার আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষাও অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে।

● **সস্তার স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার আনছে কেন্দ্র, দাম হাজারের নিচে :**

এবার সস্তার স্মার্ট মিটার আনতে চলেছে কেন্দ্র। লোকসভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানান, গ্রাহকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তারা এবার সস্তায় স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার আনার চিন্তাভাবনা করছেন। এখন একটি বিদ্যুৎ মিটারের জন্য গ্রাহককে ১০-১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। নতুন প্রকল্প চালু হলে এক হাজার টাকার নিচেই মিলবে মিটার।

উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার সে রাজ্যে ইতোমধ্যেই নতুন স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার চালু করেছে। কেন্দ্রের মতে, এ ধরনের স্মার্ট মিটারের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ চুরি এবং রিডিংয়ের কারচুপি আটকানো সম্ভব হবে। হরিয়ানাতেও এই স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার আনা হচ্ছে। এই মিটার বিষয়ে আলোচনা করতে রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসবে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবং গ্রাহকদের বিলের বোঝা কমাতে আগেই সস্তার এলইডি বাল্ব এনেছিল কেন্দ্র।

● **সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র :**

বিচারপতি জগদীশ সিং খেহরের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন বিচারপতি দীপক মিশ্র। ২৭ আগস্ট প্রধান বিচারপতির পদ থেকে বিচারপতি খেহরের অবসর। এর পরেই দায়িত্ব নিচ্ছেন বিচারপতি মিশ্র। আগামী ১৩ মাস, অর্থাৎ, ২ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন ৬৩ বছরের এই বিচারপতি। দীর্ঘদিন দিল্লি হাইকোর্টের শীর্ষ বিচারপতি পদ সামলেছেন বিচারপতি মিশ্র। নির্ভয়া কাণ্ডের রায় দিয়েছিলেন তিনি। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ২০১৩ সালে মুম্বাই হামলার অন্যতম চক্রী ইয়াকুব মেননের ঐতিহাসিক মৃত্যুদণ্ডের আদেশও দেন তিনিই।

● **রান্নার গ্যাসে ভরতুকি :**

রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম প্রতি মাসে ৪ টাকা করে বাড়িয়ে ২০১৮ সালের মার্চের মধ্যেই ভরতুকি পুরো তুলে দেওয়ার লক্ষ্যের কথা কেন্দ্র আগেই ঘোষণা করেছিল। এবার জানিয়ে দিল, আগামী বছর এপ্রিলের আগেই রান্নার গ্যাসের ভরতুকি পুরোপুরি তুলে দিতে চায় সরকার। কেরোসিনের ক্ষেত্রেও সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরতুকি পৌঁছে দিয়ে বা যত বেশি সম্ভব রাজ্যকে কেরোসিনের ব্যবহারমুক্ত করে ভরতুকি ছাঁটতে চায় সরকার। সরকারের পরিকল্পনা, স্থায়ী সম্পদ বা পরিকাঠামো তৈরিতে দু' বছরের মধ্যে ২৫ শতাংশ খরচ বাড়ানো হবে। ২০১৯-'২০ সালে সরকারের মোট ব্যয় ২৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছবে। এ বছর যার পরিমাণ ২১.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রকের 'মিডিয়াম-টার্ম এক্সপেন্ডিচার ফ্রেমওয়ার্ক' অনুযায়ী, জিএসটি চালু এবং নোট বাতিলের পরে কর ফাঁকিতে নজরদারি বেড়েছে। ফলে দেশের জিডিপি-র তুলনায় কর আদায়ের অনুপাতও বাড়বে।

তবে, গরিবদের জন্য গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসে ভরতুকি বহাল থাকছে, দাবি তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের। এখন দেশে ১৮.১১ কোটি পরিবার বছরে ১২-টি পর্যন্ত সিলিন্ডারে ভরতুকিতে পান। অন্য দিকে, প্রধানের দাবি সিলিন্ডার প্রতি কেন্দ্রকে ৮৬.৫৪ টাকা ভরতুকি গুণতে হয়। তা শূন্যে নামাতে পারলে, আরও অনেক বেশি গরিব মানুষের হেঁশেলে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেই লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত কিংবা অন্তত মার্চ অবধি দাম বাড়ানো হবে মাসে ৪ টাকা করে।

● **খুঁটি মানেই বিদ্যুতায়ন নয়, সুপারিশ কমিটির :**

এক সময়ে কোনও গ্রামে ঢোকার মুখে বিদ্যুতের খুঁটি বসলেই সেই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হ'ত। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে কি না, তা যাচাইয়ের বালাই কার্যত ছিল না। বহু রাজ্যেই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের চিত্রটি ছিল এমনই। সেই সংজ্ঞাই এবার বদলানোর সুপারিশ করল কেন্দ্রের শক্তি বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি। সম্প্রতি সংসদে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে কমিটি। তাতে সুপারিশ করা হয়েছে, এবার থেকে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ না পৌঁছলে কোনও গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে বলে ধরা হবে না। বর্তমানে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের যে সংজ্ঞা রয়েছে, তাতে কোনও গ্রামে সব মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ না পৌঁছলেও গ্রামটিকে বিদ্যুতায়নের আওতায় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। যাতে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠছে না। কেন্দ্রের দাবি, গত কয়েক বছরে ১৪ হাজারেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্য গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে ভালো কাজ করছে, তাদের জন্য প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের নিরিখে সারা দেশে প্রথম সারির কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে এখনও এ রাজ্যের সুন্দরবনে এমন চারটি গ্রমা রয়েছে, যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এখনও বাকি।

পশ্চিমবঙ্গ

● **ই-মামলার বিচারে সাইবার বিশেষজ্ঞ দল চাই :**

রাজ্যে সাইবার মামলার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু সেই মামলা লড়ার মতো পর্যাপ্ত দক্ষ সরকারি কৌঁসুলি কোথায়? কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির পরামর্শ, আগামী দশকে সাইবার মামলার সংখ্যার বহুগুণ বাড়বে। পরিস্থিতি সামলাতে তাই এখনই সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ সরকারি কৌঁসুলিদের একটি দল তৈরি করা প্রয়োজন। সম্প্রতি একটি মামলার শুনানির সময় পাবলিক প্রসিকিউটর শাশ্বতগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বিচারপতি ওই কথা বলেছেন। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য বলছে, ২০১৫ সালে গোটা দেশে সাইবার অপরাধের সংখ্যা ২০১৪ সালের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১২.১ শতাংশ। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মত, দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়বে, ততই সাইবার অপরাধের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা। পুলিশ ও আইনজীবীদের বক্তব্য, স্মার্টফোন, ই-মেলের ব্যবহার বাড়ায় খুন, ডাকাতি, প্রতারণার মামলাতেও তথ্য প্রমাণ হিসেবে সাইবার সংক্রান্ত নথি পেশ করতে হচ্ছে। এখন মামলার সওয়াল-জবাবে সাইবারের জ্ঞান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।

● **নোট বাতিলের অনুদান নিলেন ১৩ হাজার :**

আগেই ঘোষণা করা হয় বিমুদ্রীকরণের জেরে কাজ হারানো এ রাজ্যের ৫০ হাজার মানুষকে ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গত বছর ৮ নভেম্বর তারিখে হাজার ও পাঁচশো টাকার মতো বড়ো নোট বাতিলের পর সারা দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এমন সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিল। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ হাজার থাকলেও শ্রম দপ্তরের হিসেব বলছে, এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার মানুষ সেই আর্থিক সহায়তা নিয়েছেন। সে বাবদ রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে ৬৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। অর্থ দপ্তর কাজহারাদের জন্য মোট ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই শ্রম দপ্তরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● **বাসের সময়ও জানিয়ে দেবে গুগল ম্যাপ :**

সৌজন্যে গুগল ম্যাপ ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম ডব্লিউবিটিসি। গুগল ম্যাপ ইন্ডিয়ার রিয়েল-টাইম ট্রানজিট ইনফর্মেশনের সাহায্যেই এবার জানতে পারা যাবে বাসের সময়। কোন বাস কোন বাস স্টপ/স্টপেজ থেকে কখন ছাড়বে, যে কোনও বাসের রুট ম্যাপ, কোন বাস কত সময় অন্তর ছাড়ে সব কিছুই জানিয়ে দেবে গুগল ম্যাপ। এমনকী, অচেনা কোনও জায়গায় যেতে হলেও ডেস্টিনেশন টাইপ করে জেনে নিতে পারেন কোন বাসের সাহায্যে, কোন রুট দিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন আপনার গন্তব্যে। যদি কোনও কারণে বাস ছাড়তে দেরি হয় তাহলে গুগল ট্রানজিট অটোমেটিক আপডেটের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেবে। গুগল ম্যাপে সবুজ রঙে মার্ক দেখে বোঝা যাবে রিয়্যাল টাইম ইনফরমেশন। আপাতত ডব্লিউবিটিসি ট্রানজিট রুট দেখা গেলেও ভবিষ্যতে এই পরিষেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

● **সেবি-র সন্দেহের তালিকায় ৩৩১-টি সংস্থার মধ্যে ১২৭-টিই এ রাজ্যের :**

ভুয়ো সন্দেহে শেয়ার লেনদেনে রাশ টানা তালিকাভুক্ত ৩৩১-টি সংস্থার মধ্যে ১২৭-টিরই আঁতুড়ঘর পশ্চিমবঙ্গ। সংখ্যাটি দেশের সব রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি। এছাড়াও দিল্লি এবং গুজরাট-ও এ ধরনের বিপুল সংখ্যক ভুয়ো বা 'শেল' সংস্থার ঠিকানা। উল্লিখিত ৩৩১-টি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ৭ আগস্ট বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জকে নির্দেশ দিয়েছে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সেবি। সেই অনুযায়ী, ১৬২-টি সংস্থার শেয়ার লেনদেনে রাশ টানা হয়েছে পরের দিন থেকেই। জানানো হয়েছে, আপাতত তা করা যাবে মাসে এক এক দিন। বাকিগুলির ক্ষেত্রেও আগামী দিনে একই রকম কড়াকড়ির সম্ভাবনা।

● **বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর জমি বিক্রি স্থগিতের রায় বহাল :**

আপাতত বিক্রি হচ্ছে না বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের জমির একাংশ। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যালস বা বিসিপিএল-এর জমির একাংশ বিক্রির উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগে তা ছিল আগস্ট পর্যন্ত। বাড়তি জমি বিক্রি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে গত পয়লা আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কৌশিক চন্দের কাছে জানতে চান, ওই সংস্থার জমি আদৌ বিক্রির প্রয়োজন রয়েছে কি না?

সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রির সিদ্ধান্তে আগেই সায় দিয়েছিল কেন্দ্র। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের আদালতে মামলা করে সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। গত ২২ জুন মামলার শুনানিতে বিচারপতি বসাকই আগস্ট পর্যন্ত জমি বিক্রিতে স্থগিতাদেশ জারি করেন। এবার তিনি তারই মেয়াদ বাড়ালেন।

● **স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণে 'আনন্দময় শিক্ষা' :**

মানসিক ও দৈহিক শাস্তি না দিয়ে কীভাবে পড়াতে হয়, তার জন্য রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলই। তাতেই এবার 'ভালোবাসার ছোঁয়া' দিতে চায় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। পড়ুয়াদের প্রতি ভালোবাসাই যে শিক্ষাদনের শ্রেষ্ঠ পথ—ওই প্রশিক্ষণের আওতাতেই রাজ্য সরাসরি তা শেখাতে চায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এখন রাজ্যের প্রতিটি জেলার বাছাই করা দশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঁচ দিন ধরে চলে এই প্রশিক্ষণ পর্ব। তাদের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পদ্ধতি পৌঁছে যায় প্রতিটি স্কুলে। প্রশিক্ষণ দেন স্কুল শিক্ষা দপ্তর, পাঠ্যক্রম কমিটি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের প্রতিনিধিরা। এই প্রশিক্ষণের ট্যাগলাইন—'আনন্দময় শিক্ষা'। শিক্ষকদের স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী কোনওভাবেই পড়ুয়াদের মানসিক ও দৈহিক শাস্তি দেওয়া যাবে না। শিক্ষকদের এবার শেখানো হবে, পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে গেলে ভালোবাসার প্রয়োজন। সেই কারণে শুধু প্রশিক্ষণ শিবিরে নয়, প্রয়োজনে জেলায় জেলায় স্কুলে গিয়ে শিক্ষার সঙ্গে ভালোবাসার এই সম্পর্ক বোঝানো হবে।

● **এক জানলা ব্যবস্থা আইন :**

লগ্নিকারীদের বিভিন্ন ছাড়পত্র দিতে রাজ্যে এক জানালা পদ্ধতি ছিলই। এবার সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন ছাড়পত্রগুলিকে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে আনতে আইন পাস করল শিল্প দপ্তর। যে আইনমাফিক অর্থ, ভূমি, আইন, বিদ্যুৎ, পূর্ত, নগরোন্নয়ন, অগ্নি নির্বাপণের মতো দপ্তরও যাতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে সময় মেনে পরিষেবা দিতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। নজরদারির জন্য শিল্পসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়া হয়েছে। বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম (ম্যানেজমেন্ট, কন্ট্রোল অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিশনস) বিল, ২০১৭' পাস করিয়ে ওই কমিটির কথা ঘোষণা করেন শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। বিনিয়োগের আবেদন নিয়ে যাতে জটিলতা এড়ানো যায়, সে জন্যই এক জানলা ব্যবস্থায় নজরদারির ব্যবস্থা হচ্ছে। একই সঙ্গে অনলাইনে দ্রুত যাতে আবেদন প্রক্রিয়া সেরে ফেলা যায় ও আবেদন জমা দেওয়ার পরে তার অগ্রগতি এমএমএস বা ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে বলে ইবলে বলা হয়েছে। এই বিল পাস হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই নতুন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা যাবে বলে শিল্প দপ্তরের কর্তাদের আশা।

● **সাত পুরসভায় নির্বাচন :**

গত ১৮ আগস্ট রাজ্যের সাত পুরসভার ভোটের ফলাফল ঘোষণা হল। সাত পুরসভার সব ক'টিই জিতে নিয়েছে শাসক দল। দু'টি উপনির্বাচনের ওয়ার্ড ধরে সব মিলিয়ে ১৫০-টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে ১৪২-টি-তে ছ'টি জিতেছে বিজেপি। একটি করে ফরওয়ার্ড ব্লক ও নির্দল প্রার্থী। সাত পুরসভার মধ্যে দুর্গাপুর, হলদিয়া ও কুপার্স ক্যাম্পের সব আসনই পেয়েছে তৃণমূল। ধূপগুড়িতে চারটি, বুনিয়াদপুর ও পাঁশকুড়ায় একটি করে আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। নলহাটি পুরসভায় একটি আসন পেয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। সেখানেই আরও একটি আসন পেয়েছেন এক নির্দল প্রার্থী।

● **'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭' :**

রাজ্যের পুরসভাগুলিতে শীর্ষ আধিকারিক নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্য নিজের হাতে নিল। কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং হাওড়া পুরসভায় এতদিন মেয়রর পারিষদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই কমিশনার, ফিনান্স কন্ট্রোলার, চিফ অডিটরের মতো আধিকারিক নিয়োগ করতে হ'ত। গত ১৬ আগস্ট 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭' আনা হয়। এর ফলে মেয়র পারিষদের সঙ্গে আলোচনার সংস্থান আর থাকছে না অর্থাৎ, স্বশাসিত হলেও পুরসভাগুলিতে এই ধরনের পদাধিকারী নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতেই থাকছে।

● **ই-লেনদেনে প্রথম দশে ফিরল রাজ্য :**

গত পাঁচ মাসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বৈদ্যুতিন লেনদেন (ই-ট্রানজাকশন)। ইন্টারনেট মারফত সরকারি পরিষেবার দরজায় উঁকি মারার প্রবণতাও বেড়েছে অনেকখানি। আর মূলত সেই কারণেই দেশে ৩৬-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ই-গভর্ন্যান্সের তালিকায় প্রথম দশে ফিরল পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টাল ই-তালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে রাজ্যে মোট বৈদ্যুতিন লেনদেন হয়েছে প্রায় ১৮ কোটি ১৬ লক্ষ। সেই নিরিখে রাজ্য সপ্তম স্থানে। শীর্ষে গুজরাট। তার পরে এ রাজ্যের উপরে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও কেরল। মাথাপিছু লেনদেনের হিসেবেও রাজ্য ছ' নম্বরে। উত্তরপ্রদেশ ছাড়া বাকি পাঁচ রাজ্যের ঠিক পরে।

মাঝে ই-লেনদেনে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তালিকার প্রথম দিকে ফেরা তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে বেড়েছে নেটে সরকারি পরিষেবার সংখ্যাও। আপাতত মিলছে ১০১-টি। যা তামিলনাড়ুর (৬১) থেকে বেশি; তবে তেলেঙ্গানা (২২২), অন্ধ্রপ্রদেশ (২০৪) ও গুজরাটের (১৪৬) চেয়ে পিছনে। উল্লেখ্য, সারা দেশে বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন লেনদেন মেপে রাখাই কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টাল 'ই-তাল'-এর কাজ।

অর্থনীতি

➢ এশিয়ার সেরা ধনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন মুকেশ আম্বানী। চলতি বছরে হংকং-এর রিয়্যালটি ম্যাগনেট লি কা শিং-কে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন রিলায়্যান্স চেয়ারম্যান। বিশ্বের বিভিন্ন ধনীদের তালিকা দৈনিক তৈরি করে ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্স। সেই সূচক অনুযায়ী, চলতি বছরে মুকেশ আম্বানীর কোষাগারে ঢুকেছে আরও ১২৫০ কোটি টাকা।

➢ সুদ ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)। গত দশ মাসের মধ্যে এই প্রথম। এশিয়ায় তারাই প্রথম শীর্ষ ব্যাঙ্ক, যারা সুদ কমাল চলতি বছরে। স্বল্পমেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যে সুদে ঋণ নেয়, ২ আগস্ট সেই রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমে হল ৬ শতাংশ। গত ছ' বছরে সর্বনিম্ন। একইভাবে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোনা সুদও (রিভার্স রেপো রেট) ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমে হয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবর্ষের জন্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭.৩ শতাংশেই অপরিবর্তিত রইল। গত ২৮ জুলাই পর্যন্ত হিসেবে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ৩৯,২৯০ কোটি ডলার। ঋণনীতি কমিটির পরবর্তী বৈঠক ৩-৪ অক্টোবর।

● **সাড়ে ১১ লক্ষ প্যান কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র :**

প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ প্যান (পার্মান্টে অ্যাকাউন্ট নম্বর) কার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। ওই প্যান কার্ডগুলির বেশিরভাগেরই প্রতিলিপি করা হয়েছিল। ফলে এক ব্যক্তির কাছে একাধিক প্যান ছিল। এছাড়াও কিছু প্যান কার্ড ছিল ভুয়ো। গত পয়লা আগস্ট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান ভুয়ো প্যান কার্ড চিহ্নিত করতে দেশজুড়ে এখনও পর্যন্ত ৮,২৩৯-টি সমীক্ষা করা হয়েছে। ২৭ জুলাই সেই সমীক্ষার উপর একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। তাতে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২১১-টি প্যান কার্ডকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একাধিক প্যান রয়েছে। ১,৫৬৬-টি কার্ড পাওয়া গিয়েছে; যেখানে ওই নামে কোনও ব্যক্তির খোঁজই মেলেনি বা ব্যক্তির আসল পরিচয় লুকিয়ে ভুয়ো পরিচয়ে প্যান কার্ড তৈরি করা হয়েছে। চিহ্নিত করার পরেই প্যান কার্ডগুলি বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন অ্যাসেসিং অফিসাররা। ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যেও এই ধরনের সমীক্ষা করা হয়েছিল।

● **দেশে আয়কর রিটার্ন বাড়ল ২৫ শতাংশ :**

আয়কর দপ্তর জানিয়েছে, গত অর্থবর্ষের তুলনায় চলতি অর্থবর্ষে আয়কর রিটার্ন বেড়েছে ২৫ শতাংশ। আয়কর বিভাগ জানিয়েছিল, অতিরিক্ত ফাইল যাতে সুষ্ঠুভাবে জমা পড়ে ও খতিয়ে দেখা যায়, তাই রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ জুলাই থেকে বাড়িয়ে ৫ আগস্ট করা হয়। রিপোর্ট বলছে, গত বছর যেখানে ২ কোটি ২৬ লক্ষ রিটার্ন জমা পড়েছিল, সেখানে চলতি বছরের ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ আয়করদাতা রিটার্ন ফাইল জমা করেছেন। এখনও অর্থবর্ষ শেষ হতে ছয় মাসেরও বেশি বাকি। তাই আরও অনেক পরিমাণ কর সংগৃহীত হবে। অর্থমন্ত্রকের দাবি, নোট বাতিল এবং কেন্দ্রের কালো টাকা বিরোধী অভিযানের ফলেই এই সাফল্য।

● **বড়ো গাড়ির সর্বোচ্চ সেস বেড়ে ২৫ শতাংশ :**

স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্‌ল (এসইউভি)-সহ বড়ো ও দামি গাড়ির উপর সেস-এর সর্বোচ্চ হার ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব সায় দিল জিএসটি পরিষদ। অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, কেন্দ্র সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করবে। তবে কবে থেকে সেস বাড়বে, সে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে বড়ো ও দামি গাড়ি ছাড়াও 'হাইব্রিড' গাড়িতে সেস বাড়তে পারে। উল্লেখ্য, তামাক, কয়লার সেসের মতো গাড়ি থেকে আসা সেস-ও খরচ করা হবে জিএসটি লাগুর প্রথম পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে। জিএসটি জমানার আগে দেশে তৈরি গাড়িতে সেস-সহ সর্বোচ্চ কর ছিল ৫২-৫৪.৭২ শতাংশ। জিএসটি চালুর পরে তা কমে দাঁড়ায় ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত। কর ২৮ শতাংশ। তার উপরে সেস ১ থেকে ১৫ শতাংশ। এখন সেসের সর্বোচ্চ হার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশে। ৪ মিটারের বেশি লম্বা এবং ১,৫০০ সিসি-র থেকে বেশি শক্তির ইঞ্জিনের গাড়ির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

● **ডব্লিউটিও চুক্তি বাস্তবায়নে সময় বাঁধল কেন্দ্র :**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও-র শর্ত মেনে অবাধ বাণিজ্যের দরজা আরও বেশি করে খোলার লক্ষ্যে এগোতে পথনির্দেশ স্থির করল কেন্দ্র। ১৬৪-টি সদস্য দেশের মধ্যে ইতোমধ্যে সই হওয়া চুক্তি রূপায়ণে এবার সময়সীমা বেঁধে এগোতে চায় সরকার। এই চুক্তি বা ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট-এ যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে : আমদানির নিয়ম সরল করা, দ্রুত পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা, মাল ওঠানো-নামানোর পদ্ধতি আধুনিক করা। চুক্তিটি রূপায়ণের জন্য গত বছর কেন্দ্র ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে এই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে। এবার তৈরি করা হয়েছে চুক্তি রূপায়ণের পথনির্দেশ বা ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যাকশন প্ল্যান। এর সময়সীমা ২০১৭-২০২০ সাল। তার মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কোন কোন প্রস্তাব স্বল্প (০-৬ মাস), মাঝারি (৬-১৮ মাস) ও দীর্ঘমেয়াদে (১৮-৩৬ মাস) রূপায়ণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সালে স্থাপনের পর থেকেই ডব্লিউটিও-র প্রধান লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যকে যথাসম্ভব অবাধ করা। কর ও পরিমাণগত বিধিনিষেধ সরল করে ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যে এগোনো। ২০১৪ সালে ডব্লিউটিও সদস্যরা সিলমোহর দেয় ওই ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট-এ। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য, দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন পণ্য মজুতের ব্যবস্থা উন্নত করা। এ ধরনের আমদানিকৃত পণ্যকে ছাড়পত্র দিতে হবে দেশে আসার ১২ ঘণ্টার মধ্যে। রপ্তানি পণ্যের জন্য তা ৮ ঘণ্টা। মাঝারিমেয়াদে সব তথ্য ইন্টারনেটে রাখতে হবে। একজানলা ব্যবস্থায় একটি পোর্টাল মারফত তা জানা যাবে। দীর্ঘমেয়াদে বাণিজ্যে বাধা ভাঙতে আরও ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ। অনলাইন বাণিজ্য সরল করতে নথিপত্র দাখিলে কড়াকড়ি কমানোর প্রস্তাব।

● **চার প্রতিরক্ষা সংস্থার শেয়ার ছাড়বে কেন্দ্র :**

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত চারটি সংস্থার বিলগ্নীকরণের জন্য প্রথমবার বাজারে শেয়ার ছাড়ার পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র। বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়। এবার শুরু হয়েছে শেয়ার ছেড়ে সংস্থাগুলিতে কেন্দ্রের হাতে থাকা ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অংশীদারিত্ব বেচার প্রক্রিয়া। এই চার সংস্থা হল—গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, ভারত ডায়নামিক্স, মাঝগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স এবং মিশ্র ধাতু নিগম। এপ্রিলে সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণে সায় দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি। তার পরে শেয়ার বিক্রি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার ও আইন বিশেষজ্ঞদের থেকে দরপত্র চায় কেন্দ্র। ১৮ আগস্টের

মধ্যে তা ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে জমা পড়ে। তবে বাজারে কবে এই শেয়ার নথিভুক্ত হবে, তা এখনও স্থির হয়নি।

প্রসঙ্গত, টানা সাত বছর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারের হাতে থাকা শেয়ারের একাংশ বাজারে ছেড়ে টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেও, তা পূরণ করতে পারেনি কেন্দ্র। শেষপর্যন্ত গত অর্থবর্ষে (২০১৬-'১৭) লক্ষ্যমাত্রা ছাপায় বিলগ্নীকরণের সীমা। দাঁড়ায় ৪৬,২৪৭ কোটি টাকায়। লক্ষ্য ছিল, ৪৫,৫০০ কোটি। আর এই অর্থবর্ষে এক ধাপ এগিয়ে বিভিন্ন সংস্থা বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে ৭২,৫০০ কোটি তোলার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। যার মধ্যে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার বেচে এসেছে ৯,৩০০ কোটি। বিলগ্নীকরণের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে চলতি বছর আইআরসিটিসি, আইআরএফসি, আইআরসিওএন-এর মতো ভারতীয় রেলের শাখা সংস্থাগুলিকে বাজারে নথিভুক্তি করতে চায় কেন্দ্র। প্রথমবার শেয়ার ছাড়া হবে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থারও। বেশ কিছু সংস্থার শেয়ার মিলিয়ে ইটিএফ তৈরির মাধ্যমেও সংস্থাগুলির অংশীদারিত্ব বেচা হবে। গত ৪ আগস্ট সেই ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। একই দিনে প্রতিরক্ষা সংস্থার শেয়ার বিক্রির কথাও জানায় কেন্দ্র।

● **২২-টি সংস্থার জন্য কেন্দ্রের 'ভারত-২২' ইটিএফ :**

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বেচতে হালে এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডের (ইটিএফ) হাত ধরছে কেন্দ্র। এবার নতুন একটি ইটিএফ প্রকল্প, ভারত-২২ তৈরি করল সরকার। যার আওতায় থাকছে ছ'টি শিল্পের মোট ২২-টি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার। ভারত-২২ কেন্দ্রের তৈরি দ্বিতীয় ইটিএফ। এর আগে, গত অর্থবর্ষে প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার (সিপিএসই) ইটিএফ আনে সরকার। যেখান থেকে তিন দফায় ওঠে ৮,৫০৯ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, নতুন ইটিএফ-টি ভোগ্যপণ্য, আর্থিক বিদ্যুৎ-সহ ছ'টি ক্ষেত্রের শেয়ার নিয়ে তৈরি হয়েছে। নতুন ইটিএফ-এর আওতায় থাকছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা (ভারত ইলেকট্রনিক্স, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া, এনটিপিসি, এনএইচপিসি, গেইল এনবিসিসি ইত্যাদি), তিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক (স্টেট ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা) ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে কেন্দ্রের হাতে থাকা শেয়ার। থাকছে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার সম্পদ কেনার জন্য তৈরি কেন্দ্রীয় সংস্থা দু'টি ও সরকারের হাতে থাকা আইটিসি এবং এল অ্যান্ড টি-র শেয়ারও। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে তেল-গ্যাস, কয়লা ও খনন ক্ষেত্রের ওএনজিসি, আইওসি, বিপিসিএল, কোল ইন্ডিয়া ও নালকো-ও সামিল।

উল্লেখ্য, হালে ইটিএফ-এ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র। কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে টাকা তারা বাজারে খাটাচ্ছে, তা-ও করা হচ্ছে ইটিএফ-এর মাধ্যমেই। প্রসঙ্গত, ইটিএফ একটি মিউচুয়াল ফান্ড। লগ্নির অঙ্কের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীরা পান ইউনিট। প্রথমবার ইটিএফ বাজারে ছাড়ার সময় ইউনিট কেনা যায়। পরেও তা লেনদেন হতে থাকে বাজারে। সুবিধা হল, ওই ইউনিট শেয়ার বাজারে বেচে লগ্নিকারী নগদ টাকা ওঠাতে পারেন।

● **নিফ্‌টি-র ১০ হাজারের শৃঙ্গ জয় :**

গত ২৫ জুলাই নিফ্‌টি ইতিহাসে প্রথমবার ছুঁয়ে ফেলল ১০ হাজারের ঘর। পৌঁছে গেল ১০,০১১.৩০ অঙ্কে। লেনদেনের একটা সময়ে নিফ্‌টি ৪৪.৯০ পয়েন্ট বেড়ে যায়। অবশ্য দিনের শেষে এই সূচক সে জায়গা ধরে রাখতে পারেনি। ৯,৯৬৪.৫৫ অঙ্কে থিতু হয়। অবশেষে নিফ্‌টি-র ১০ হাজারের শৃঙ্গ জয় ভারতীয় শেয়ার বাজারের কাছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, একটি বড়ো মাইলফলক। প্রথম ছোঁয়ার পরে বার বার পিছলে গেলেও, ওই সপ্তাহের শেষে কিন্তু ৫০-টি নামী শেয়ারের সূচক নিফ্‌টি থেকে যায় ১০ হাজারের ঘরেই। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-এর ২১ এপ্রিল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক হিসেবে যাত্রা শুরু নিফ্‌টি-র। সে সময়ে এই সূচকের ভিত্তি-মূল্য ছিল ১,০০০। নানা টানাপোড়েন, উত্থান-পতনের পথ ধরে ২১ বছর পরে এই সূচক পৌঁছল ১০ হাজারে। ২১ বছরে ১০ গুণ কিন্তু অত্যন্ত ভালো রিটার্ন। ভালো শেয়ার দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখলে তা কত লাভ বা আয়ের সুযোগ এনে দিতে পারে, নিফ্‌টি-র এই বৃদ্ধি তারই ইঙ্গিত।

● **অর্থনীতির সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান :**

গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধির হার এক ঝটকায় নেমে এসেছে ০.৪ শতাংশে, যা গত ১৯ মাসে সর্বনিম্ন। পাশাপাশি, রাজকোষ ঘাটতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক, এপ্রিল থেকে জুনে ছুঁয়ে ফেলেছে গোটা বছরে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ৮০.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, মোট শিল্পোৎপাদনের ৪১ শতাংশ পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অবদান। আটটি পরিকাঠামো শিল্পে মে মাসে উৎপাদন বেড়েছিল ৪.১ শতাংশ হারে। গত বছর জুনে তা ছিল ৭ শতাংশ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে মূলত, কয়লা, সোধনাগারের পণ্য, সার ও সিমেন্ট উৎপাদন সরাসরি কমার জেরেই জুনে নেমে এসেছে সার্বিকভাবে পরিকাঠামোয় বৃদ্ধির হার। এদিকে, চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাস, এপ্রিল থেকে জুনে দেশের রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৪২ লক্ষ কোটি টাকা, যা বছরের আগাম হিসেবের ৮০.৮ শতাংশ. গত অর্থবর্ষের একই সময়ে ছিল তা ৬১.১ শতাংশ। কন্ট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এপ্রিল-জুনে নিট কর রাজস্ব আদায় হয়েছে ১.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা বছরের হিসেবের ১৪.৫ শতাংশ। ব্যয় ছুঁয়েছে ৬.৫০ লক্ষ কোটি, যা বার্ষিক হিসেবের ৩০ শতাংশ।

● **থাকবে এইচপিসিএল-এর ব্র্যান্ড স্বাতন্ত্র্য :**

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (এইচপিসিএল) সরকারি অংশীদারিত্ব ওএনজিসি-র হাতে যাওয়ার পরেও পরিচালন পর্ষদ ও ব্র্যান্ড পরিচিতিতে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে প্রথমোক্ত সংস্থাটির। বদলাবে না রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তকমাও। ওই শেয়ার হাতবদলের প্রক্রিয়া দ্রুত ও মসৃণ করতে তৈরি তিন মন্ত্রীর কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। বাকি দু'জন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী। গত ২৪ জুলাই লোকসভায় এ কথা জানান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। সম্প্রতি এইচপিসিএল-এ সরকারের অংশীদারিত্ব (৫১.১১ শতাংশ) ওএনজিসি-কে বেচতে নীতিগতভাবে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আর্থিক বিষয়ক কমিটি। এই পরিকল্পনার কথা বাজেটেই বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী জেটলি। এজন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে ওএনজিসি। এই মুহূর্তে এইচপিসিএল-এর বছরে তেল শোধন ক্ষমতা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টন। সংযুক্তির পরে ওএনজিসি-

র শোধনাগারগুলিও যাবে এইচপিসিএল-এর আওতায়। অর্থাৎ, মূলত তেল-গ্যাস উত্তোলনেই নজর দেবে ওএনজিসি।

● **পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে পেট্রোকেম তালুকের পরিকল্পনা :**

দেশে জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য পেট্রোপণ্যের চাহিদা বাড়ছে দ্রুত রপ্তানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে তা মেটাতে একগুচ্ছ পেট্রোকেম তালুক গড়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করল কেন্দ্র। গত ২৯ জুলাই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দু'টি করে এবং দক্ষিণ ভারতে আরও কয়েকটি পেট্রোকেম তালুক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তালুকে তেল শোধনাগার থাকবে। যাতে পেট্রোকেম শিল্পের পুরো চেন এক জায়গায় থাকে। তালুকগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে অনুসারী শিল্প। এ ধরনের প্রকল্পের উপযোগিতা বোঝাতে দক্ষিণ গুজরাটের দহেজে দেশের অন্যতম বৃহৎ পেট্রোকেম কারখানা ওএনজিসি পেট্রো অ্যাডিশন্সের কথা তোলের মন্ত্রী। ওই কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক অনুসারী শিল্প। সম্ভাব্য লগ্নি ৬০০-৭০০ কোটি ডলার (৩৯-৪৬ হাজার কোটি টাকা)।

রপ্তানি নির্ভরতা কমাতে হালে একাধিক পদক্ষেপ করেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। পাঁচ বছরে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় রাজাপুরের কাছে বাবুলওয়াড়িতে দেশের বৃহত্তম তেল শোধনাগার ও পেট্রো-রসায়ন কেন্দ্র গড়ার কথা। সম্ভাব্য লগ্নি ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। যৌথভাবে তা তৈরি করবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। বছরে ৬ কোটি টন উৎপাদন ক্ষমতা এই শোধনাগারের।

● **অবাধ বাণিজ্যই বাঁচাবে বিশ্বকে :**

আর্থিক রক্ষণশীলতার নীতি আঁকড়ে চলার মানসিকতা নিয়ে ফের বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তাদের পরামর্শ, যে কোনও মূল্যে অবাধ বাণিজ্য বিরোধী সিদ্ধান্তগুলিকে এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। বার্ষিক রিপোর্টে বিশ্ব অর্থনীতির অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করেছে আইএমএফ। জানিয়েছে, মন্দার পর থেকে বিশ্বে মোট বাণিজ্য ও লগ্নির বৈষম্য কমেছে ঠিকই। কিন্তু বেড়েছে উন্নত দেশগুলিতে বাড়তি জোগান ও বাণিজ্য ঘাটতির চাপ। যা অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। তাই তাদের এমন নীতি গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে, যা উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি কমাবে। সেই প্রসঙ্গেই যে কোনও মূল্যে রক্ষণশীল নীতিকে এড়ানোর কথা বলেছেন আইএমএফ-এর প্রধান গবেষক লুই কুবেডু। তার মতে, এই নীতি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

● **আইএমএফ-এর পূর্বাভাস :**

আর্থিক বৃদ্ধির হার ভারত যে শুধু ধরে রাখবে তাই নয়, বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশের তকমাও বহাল রাখা সম্ভব হবে। অন্য দিকে, আর্থিক কর্মকাণ্ড তলানিতে নেমে আসার জেরে সবচেয়ে ঢিমেতালে এগোবে ব্রিটেন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ) গত ২৪ জুলাই প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক-এ এই পূর্বাভাস দিয়েছে। জানিয়েছে, ভারতে চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশই থাকবে। এপ্রিলের সমীক্ষাতেও একই ইঙ্গিত ছিল। পাশাপাশি, ২০১৮-'১৯ সালে তা ৭.৭ শতাংশে পৌঁছে যাবে। চিনের জন্য আইএমএফ-এর পূর্বাভাস এ বছরে ৬.৭ শতাংশ, যা এপ্রিলের তুলনায় সামান্য বেশি এবং পরের অর্থবর্ষে ৬.৪ শতাংশ। প্রসঙ্গত, ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার ছুঁয়েছে ৭.১ শতাংশ।

ভারতের এই উজ্জ্বল ছবির পাশাপাশি ব্রিটেন ও আমেরিকার যথেষ্ট ম্লান বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস দিয়েছে এই সমীক্ষা। ব্রিটিশ অর্থনীতি চলতি অর্থবর্ষে এগোবে আগের চেয়েও ঢিমেতালে, মাত্র ১.৭ শতাংশ হারে। আগের পূর্বাভাস ছিল ২ শতাংশ। আগামী অর্থবর্ষের জন্য তা ধরা হয়েছে ১.৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে ইউরোপীয় অঞ্চল এ বছরে ১.৯ শতাংশ হারে এগোবে বলে আশা করছে আইএমএফ, আগের পূর্বাভাস ১.৭ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও বৃদ্ধির পূর্বাভাস ২.৩ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ২.১ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির পূর্বাভাস এপ্রিলের মতোই ৩.৫ শতাংশ রেখেছে অর্থভাণ্ডার। ২০১৮ সালে তা সামান্য বেড়ে ৩.৬ শতাংশ ছোঁবে।

● **সব কর্মীকে ন্যূনতম বেতন দিতে বিলে সায় মন্ত্রিসভার :**

কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন বিলটিকে ২৬ জুলাই অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই বিলে শ্রমিক সংক্রান্ত চারটি আইন একই ছাতার তলায় এনে সব শিল্পের সমস্ত কর্মীর জন্যই ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে দেশজুড়ে ৪ কোটি কর্মী উপকৃত হবেন। এক জন কর্মী ন্যূনতম মজুরির সুবিধা পাবেন কি না, তা আর তার বেতনের উপর নির্ভর করবে না। এত দিন যারা মাসে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন, শুধু তাদেরই ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় আনা হ'ত। নতুন বিলের প্রস্তাব অনুসারে এবার থেকে তার বেশি বেতন পেলেও মিলবে এই সুবিধা। চলতি বাদল অধিবেশনেই বিলটি সংসদে কেন্দ্রের পেশ করার কথা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিলে অনুমোদন মিলেছে। এই মজুরি বিধি সংক্রান্ত বিল (দ্য লেবার কোড অন ওয়েজেস বিল)-এর আওতায় যে-চারটি আইন আনা হবে, সেগুলি হল : ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮; বেতন আইন, ১৯৩৬; বোনাস আইন, ১৯৬৫; সমান মজুরি আইন, ১৯৭৬। প্রস্তাব অনুযায়ী, সব ক'টি আইন এক ছাতার তলায় এলে প্রতিটি শিল্পেই ন্যূনতম মজুরি দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে। রাজ্যগুলিকেও এই নিয়ম মানতে হবে। তবে চাইলে তারা কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া হারের তুলনায় বেশি বেতনও দিতে পারবে।

● **পিএফ অ্যাকাউন্টের টাকা ট্রান্সফার :**

চাকরি বদলালেই এবার ট্রান্সফার হয়ে যাবে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) অ্যাকাউন্ট। ইপিএফ পরিষেবাতে শীঘ্রই এই নয়া ব্যবস্থা চালু হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ভি. পি. জয়। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) সূত্রে দাবি করা হয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থা অনেক বেশি সুবিধাজনক। যদি কেউ কর্মসূত্রে দেশের বাইরেও যান, তাহলেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে। মুখ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার জানিয়েছেন, কেউ চাকরি বদলালে তার অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে যায়। ফের নতুন করে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় কেউ চাকরি বদলালে কোনও আবেদনপত্র ছাড়াই মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তার পিএফ অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য শুধু আধার নম্বর

নথিভুক্ত করতে হবে। কোনও কর্মী তার আধার নম্বর আগেই নথিভুক্ত করে থাকলে তিনি দেশের যেখানেই থাকুন না কেন কোনও আবেদনপত্র ছাড়াই অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার হয়ে যাবে।

● **সংসদে পাস ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধনী বিল :**

গত ১০ আগস্ট রাজ্যসভায় ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী বিল পাস হয়। এই আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইন মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিতে পারবে। পুরনো ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কের কর্তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও পরে তাদের ঘাড়ে দায় এসে পড়তে পারে বলে পিছিয়ে যেতেন। এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই নির্দেশ দেবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিতে আগেই ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশোধন করে অধ্যাদেশ এনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভার পর এবার রাজ্যসভায় সেই বিলটিই পাস করিয়ে তাকে আইনের চেহারা দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, নতুন দেউলিয়া আইনের আওতায় নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যেই ১০০-টির বেশি সংস্থা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) আবেদন করেছে।

খেলা

- ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পুলিশ ও ফায়ার গেমসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত সুষেণ রায় লং জাম্পে সোনা জিতলেন। ২৮ বছর বয়সি সুষেণ ২০০৮ সালে পুলিশে যোগ দেন।
- গত ১৮-৩০ জুলাই তুরস্কে অনুষ্ঠিত ২৩তম 'সামার ডেফ অলিম্পিক'-এ দলগত ৪ × ১০০ মিটার রিলে দৌড়ে সপ্তম স্থান পেয়েছে ভারতের দল। সেই দলেই ছিলেন মেদিনীপুরের মূক ও বধির ক্রীড়াবিদ শ্রীকৃষ্ণ মাহাতো। প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়েও অংশ নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।
- গত ১৯ আগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নিয়ে শুধু ইংল্যান্ডকেই জেতাননি, পাশাপাশি ব্যক্তিগত একটা রেকর্ডও করেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ইয়ান বোথামের ৩৮৩ টেস্ট উইকেট টপকে গিয়েছেন তিনি। ১০৭ টেস্টে ৩৮৪ উইকেটের মালিক এখন ইংল্যান্ডের এই পেসার।
- গত ১০ আগস্ট বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে এক বিরলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ১৩ বছরের ব্রিটিশ ক্রিকেটার লুক রবিনসন। ফিলাডেলফিয়া ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৩ টুর্নামেন্টে ৬ বলে ৬ উইকেট নেওয়ার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেন রবিনসন। শুধু ক্লাব স্তরের ক্রিকেটেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও এটি একটি রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেট, এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বা টি-২০ ক্রিকেট, যে কোনও ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি কোনও বোলার।
- গত ১৯ থেকে ২৪ আগস্ট মুম্বাইয়ে ত্রিদেশীয় ফুটবল সিরিজের আয়োজন করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশান (AIFF)। এই অ্যাসোসিয়েশান ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৯-র এএফসি এশিয়ান কাপ-এর কোয়ালিফিকেশান ম্যাচের তৃতীয় রাউন্ডের জন্য পুরুষদের সিনিয়ার দলের প্রস্তুতি পর্বের অংশ। সিরিজ জিতে নেয় ভারত।
- ইংলিশ চ্যানেল পেরোল কালনার সায়নী দাস। গত ২৬ জুলাই ভারতীয় সময় সকাল দশটা নাগাদ সাঁতার শেষ হয় তার। সময় লাগে ১৪ ঘণ্টা ৮ মিনিট। কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাসিন্দা সায়নী হুগলির শ্রীরামপুর কলেজে ইতিহাসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। এর আগে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে একাধিক সোনা, রুপো জিতেছেন তিনি। গত ৮ জুলাই ইংল্যান্ড রওনা দেন তিনি।

● **মাঝপথে থমকে গেল বোল্টের বিদায়ী দৌড় :**

গত ১২ আগস্ট গভীর রাতে ট্র্যাকে নামলেও রেস শেষ করতে পারলেন না কিংবদন্তি স্প্রিন্টার উসেইন বোল্ট। চোখের জলে ট্র্যাককে বিদায় জানালেন। এদিন আইএএএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের রিলে ফাইনালে সকলের চোখ ছিল বোল্টের দিকেই। ১০০ মিটার রেসে সোনা জিততে না পারায় রিলেকেই পাখির চোখ করেছিলেন বোল্ট। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে রিলেতেও মুখ থুবড়ে পড়তে হল। যুহান ব্লেকের হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিলেন। কিন্তু ফিনিশিং লাইনের কাছে হঠাৎ করেই টান ধরে তার পায়ে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্র্যাকেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। সতীর্থদের কাঁধে চেপে ট্র্যাক ছাড়েন বোল্ট। প্রসঙ্গত, ২০০৯-এর পর এই প্রথম সেরা স্প্রিন্ট প্রতিযোগিতার আসরে সোনা জিততে ব্যর্থ হল জামাইকা। এদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রিলেতে সোনা জিতে নেয় ব্রিটেন এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রুপো জেতে আমেরিকা। গত ন' বছর ধরে স্প্রিন্ট ট্র্যাকে একাই রাজত্ব করে গেছেন বোল্ট। অলিম্পিক থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, প্রতিটি মেজর ইভেন্টেই জিতেছেন সোনা। জীবনের শেষ একশো মিটার দৌড়ে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাস্টিন গ্যাটলিনের কাছে হেরে গেলেন কিংবদন্তি এই অ্যাথলিট। তৃতীয় হয়ে ট্র্যাক ছাড়তে হয় তাকে।

অন্যদিকে, লন্ডন বিশ্ব মিট অভিযান দুরন্তভাবে শুরু করলেন আর এক কিংবদন্তি মো ফারা। ১০ হাজার মিটারে সোনা জিতে। সময় নিলেন ২৬ : ৪৯.৫৩। ২০১২ অলিম্পিক্সে যেখানে সোনা জিতেছিলেন সেই লন্ডন স্টেডিয়ামেই ফের সোনা জিতলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। উগান্ডার জোশুয়া চেপটগেই রুপো জেতেন আর ব্রোঞ্জ পান কেনিয়ার পল তানুই। ৩৪ বছরের ব্রিটিশ অ্যাথলিট ফারা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বোল্টের মতোই লন্ডন মিটের পরই তিনি অবসর নেবেন।

● **৪৪ পাসে বিস্ময় গোল রিয়ালের :**

চুয়াল্লিশ পাসে গোল করে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিলেন কার্লোস হেনরিক ভেনানসিও ক্যাসিমিরো! গত ২০ আগস্ট রাতে দেপোর্তিভো লা করুনা-কে ৩-০ উড়িয়ে লা লিগায় অভিযান শুরু করে রিয়াল মাদ্রিদ। দুরন্ত জয় স্মরণীয় হয়ে থাকল ক্যাসিমিরো-র বিস্ময় গোলে। অ্যাওয়ে ম্যাচে ২০ মিনিটে গ্যারেথ বেলে-র গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। তার সাত মিনিট পরেই গোল করেন ব্রাজিল জাতীয় দলের মিডফিল্ডার। ম্যাচের ২৭ মিনিটে যে আক্রমণ শুরু মার্কোস লরেন্তের সঙ্গে গোলরক্ষক কেইলোর নাভাসের ওয়াল পাস থেকে। নিজেদের মধ্যে মোট চুয়াল্লিশটি পাস খেলে বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে পৌঁছে গোল করেন ক্যাসিমিরো। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে, রিয়ালের প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে এই গোলের নেপথ্যে।

● **টি-২০-তে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান অ্যাডাম লিথের :**

টি-২০-তে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানটি হল গত ১৭ আগস্ট। ন্যাটওয়েস্ট টি-২০ ব্লাস্টের খেলায় ইয়র্কশায়ারের ব্যাটসম্যান অ্যাডাম লিথের দুরন্ত ব্যাটিং-এর দৌলতে। ৭৩ বলে ১৬১ রান। তার মধ্যে ২০-টি বাউন্ডারি আর সাতটি ওভার বাউন্ডারি। মাত্র ১৪ রান পিছিয়ে থাকলেন ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের থেকে। আইপিএল-এ বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে ক্রিস গেইল ৬৬ বলে করেছিলেন ১৭৫ রান। গত বছর তার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন জিম্বাবোয়ের হ্যামিল্টন মাজাকাডজা। তিনি করেন অপরাজিত ১৬২ রান। আর এবার অ্যাডম থামলেন ১৬১-তে। মাত্র এক রান পিছনে। শুধু তাই নয়। ইয়র্কশায়ারের টিম টোটাল ২৬০। বিশ্ব রেকর্ডের থেকে মাত্র তিন রান পিছিয়ে। এই রেকর্ড এই মুহূর্তে রয়েছে বেঙ্গালুরু ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে। দু' দলেরই রান ২৬৩। লিথ ইংলিশ ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ছাপিয়ে গেলেন ব্রেন্ডন ম্যাকালামকেও। ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে ম্যাকালামের রান ছিল ১৫৮।

● **১৬ বছরেই বুলগেরিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন ভারতের লক্ষ্য সেন :**

গত ১৬ আগস্ট নিজের ১৬ বছরের জন্মদিনে সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার দিনুকা করুণারত্নেকে ২১-১৯, ২১-১৪-তে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল উত্তরাখণ্ডের শাটলার লক্ষ্য সেন। আর তার পরের দিনই বুলগেরিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন সিরিজ চ্যাম্পিয়ন হলেন। ফাইনালে হারান ক্রোয়েশিয়ার জোনিমির দুরকিনজাককে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় ফাইনাল ম্যাচে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই জোনিমিরের বিরুদ্ধে লক্ষ্যর ম্যাচ চলে ৫৭ মিনিট। ১৮-২১, ২১-১২, ২১-১৭ গেমে ভারতের পরবর্তী ব্যাডমিন্টন প্রজন্মের ভরসা লক্ষ্য সেন জয় হাসিল করে। সম্প্রতি প্রাক্তন অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন পিটার গেডের কাছে ট্রেনিং করেছিলেন লক্ষ্য সেন। ফ্রেঞ্চ জাতীয় দলের হেড কোচ তিনি। ফেব্রুয়ারিতে সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও উঠেছিলেন। এই টুর্নামেন্টে আগাগোড়া দারুণ খেলে শীর্ষ বাছাই সাম পার্সন্সকে প্রথম রাউন্ডেই হারিয়েছিল লক্ষ্য।

● **ওরসেস্টারশায়ারে অশ্বিন :**

ওরসেস্টারশায়ারে যোগ দিলেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এবার কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে অশ্বিনকে। ২০০৬ সালে জাহির খানের পর অশ্বিনই প্রথম ভারতীয় যিনি যোগ দিলেন এই দলে। দারুণ সফল ছিলেন জাহির। অশ্বিনকে নেওয়া হল অস্ট্রেলিয়ার জন হেস্টিংসের জায়গায়। ৫১-টি টেস্টে অশ্বিন ইতোমধ্যেই ২৮৬-টি উইকেট নিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে ২৬ বার পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব। একদিনের ক্রিকেটেও অশ্বিনের উইকেট ১৫০। ব্যাটেও সফল অশ্বিন ইতোমধ্যেই টেস্টে ২০০৪ রান করে ফেলেছে।

● **মারে-কে সরিয়ে ফের শীর্ষে নাদাল :**

কানাডিয়ান ওপেনের ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে হারের পরে সিনসিনাটি ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন রজার ফেডেরার। ফলে রাফায়েল নাদালের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে চলে আসা নিশ্চিত হয়ে গেল। মন্ট্রিয়লে আলেকজান্ডার জেভারভের কাছে হারের পরেই সাতবারের চ্যাম্পিয়ন সুইস মহাতারকা ফেডেরার পিঠের চোটের জন্য সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম তুলে নেন। এর ফলে নাদাল ২০১৪-র জুলাইয়ের পরে প্রথমবার ফের এক নম্বরে উঠে আসছেন। অবশ্য চলতি মরসুমে তার পারফরম্যান্সও দুরন্ত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ফেডেরার নাদালকে হারিয়ে দিলেও ফরাসি ওপেন জিতে নতুন রেকর্ড গড়েন স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন। শুধু ১০ নম্বর রোলাঁ গ্যারো খেতাবই নয় সঙ্গে আরও তিনটি ট্রফি জিতেছেন চলতি মরসুমে নাদাল। ২০০৮-এর আগস্টে র‍্যাঙ্কিং শীর্ষে প্রথমবার উঠে আসার পর থেকে তিনবার সিংহাসনে বসেছেন নাদাল। সব মিলিয়ে তিনি বিশ্বের এক নম্বর ছিলেন ১৪১ সপ্তাহ।

● **জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা :**

ভারতীয় জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। গত ২০ আগস্ট শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রথম সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তবে, জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে সদ্য নিযুক্ত হলেও অধিনায়কত্ব রোহিতের কাছে নতুন নয়। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে একের পর এক নজরকাড়া পারফরম্যান্সের নজির রেখেছেন তিনি। রোহিতের নেতৃত্বই তিনবার আইপিএল জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ন্স।

● **রজার্স কাপ :**

গত ১৩ আগস্ট রজার্স কাপের ফাইনালে জার্মান প্রতিপক্ষ আলেকজান্ডার জেভারভের কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে গেলেন সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার। ৬-৩, ৬-৪ সেটে হার স্বীকার করতে হল বিশ্ব টেনিসের অন্যতম মহাতারকা ফেডেরারকে। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পর উইম্বলডনের আসরে সেরার খেতাব জয়, চলতি মরসুমের একের পর এক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ফেডেরার। অন্যদিকে, ২০ বছর বয়সি জেভারভ এর আগের সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসিতে টুর্নামেন্ট জেতার পরে কানাডা ওপেনও জিতে সুইস মহাতারকার মতো পাঁচটি ট্রফি পান চলতি মরসুমে, যার মধ্যে দু'টি এটিপি ১০০০ খেতাব। ফেডেরারের এ মরসুমে পাঁচটি ট্রফির দু'টি অবশ্য গ্র্যান্ড স্ল্যাম। তবে মন্ট্রিয়লে ফেডেরারের হারিয়ে সুইস মহাতারকার টানা ১৬-টা ম্যাচ জেতার দৌড় থামিয়ে দেন জেভারভ। উল্লেখ্য, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেন শুরু হচ্ছে ২৮ আগস্ট।

● **১৮ কোটি দর্শক দেখল মহিলা বিশ্বকাপ :**

সফল আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ। ভিউয়ারশিপের বিচারে গত বছরের থেকে সাফল্যের মাত্রা ছাড়িয়েছে ৩০০ শতাংশ। আইসিসি সম্প্রতি একটি প্রেস রিলিজয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলের দর্শকের সংখ্যা ২০১৩-র থেকে অনেকটাই বেশি। অস্ট্রেলিয়ায় টেলিভিশনে মহিলা বিশ্বকাপ দেখার সময় বেড়েছে ১৩১ শতাংশ। আইসিসি-র হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ১৮ কোটি মানুষ এই ইভেন্ট দেখেছে। তার মধ্যে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ দর্শক দেখেছে শুধু ভারতে। তার মধ্যে গ্রামীণ ভারতে দর্শকের সংখ্যা ৮ কোটি। শুধু ফাইনাল দেখেছে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ। ভারতের দর্শক ঘণ্টার হিসেবে বেড়েছে ৫০০ শতাংশ। ইংল্যান্ডে সব থেকে বেশি দর্শক ফাইনাল দেখেছে। অন্য কোনও টুর্নামেন্টের থেকে অনেক বেশি। আইসিসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ১০ কোটি দর্শক দেখে বিশ্বকাপ। ট্যুইটারে বিশ্বকাপের হ্যাশট্যাগ #WWC17 সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ১ কোটি ট্যুইট হয়েছে মহিলা ক্রিকেট নিয়ে। শুধু তাই নয়, ১০০-টির উপর দেশে সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইট

মিলে ৫০ হাজারের উপর খবর প্রকাশিত হয়েছে। যে তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত, ১৬ হাজার আর্টিকেল-এর দৌলতে। ইংল্যান্ড রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে ১৪ হাজার আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ৯ হাজার আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে আমেরিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

● **ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ব্রাজিল :**

জার্মানিকে টপকে শীর্ষে উঠে এল ব্রাজিল। ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৬০৪। ১৫৪৯ পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে নেমে গেল জার্মানি। তিন নম্বর স্থান ধরে রাখল আর্জেন্টিনা। তাদের পয়েন্ট ১৩৯৯। এর মধ্যেই এক ধাপ নেমে গেল ভারতীয় ফুটবল। অনেকদিন পর সেরা ১০০-তে ঢুকেছিল ভারত। উঠে এসেছিল ৯৬ নম্বরে। এক মাস না খেলার খেসারত দিতে হল ভারতকে। ৯৬ থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে যেতে হল ৯৭-এ। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ৩৪১। পাঁচ ধাপ উঠে কানাডা জায়গা করে নিয়েছে ৯৫ নম্বরে। এশিয়ান র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত রয়েছে ১২ নম্বরে। এই তালিকায় শীর্ষে ইরান।

● **চিনের জুলপিকরকে হারালেন ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং :**

এশিয়ার রাজা হওয়ার লড়াইয়ে নেমে গত ৫ আগস্ট মুম্বাইয়ে চিনের জুলপিকর মইমইতিয়ালি-কে হারিয়ে দিলেন ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং। একই সঙ্গে নিজের ডব্লিউবিও এশিয়া প্যাসিফিক সুপার মিডলওয়েট খেতাব ধরে রাখার পাশাপাশি জিতে নিলেন জুলপিকরের ডব্লিউবিও ওরিয়েন্টাল বেল্টও। দশ রাউন্ডের বাউট। প্রতিটায় তিন মিনিটের লড়াই। যার ডাক নামটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নক আউট সিং', তাকেই যে পুরো দশ রাউন্ড পর্যন্ত লড়তে হবে, এটা স্বয়ং বিজেন্দ্রও ভাবেননি এবং শুধু লড়াই নয়, রীতিমতো রক্তাক্ত হতে হয়। প্রো কেরিয়ারে ন' নম্বর ম্যাচ জিতে নিলেন। এই নিয়ে পেশাদার বক্সিং কেরিয়ারের ৯-টি লড়াইয়ের ৯-টি-তেই জয় হরিয়ানার তারকা বক্সারের। বাউটের পর রক্তাক্ত বিজেন্দ্র আর তার পাশে দাঁড়ানো জুলপিকরকে দেখে অবশ্য বোঝা যায়নি চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছেন। তবে বিচারকরা সর্বসম্মতভাবেই বিজেন্দ্রকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেন। পাঁচবার অবৈধভাবে বিজেন্দ্রকে মারার জন্য রেফারি সতর্ক করে দেন জুলপিকরকে। অন্যদিকে, বেজিং অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ভারতীয় বক্সার অখিল কুমার জীবনের প্রথম পেশাদার লড়াইয়ে হারান অস্ট্রেলিয়ার টাই গিলক্রিস্টকে। আর এক লড়াইয়ে জিতেন্দ্র কুমার জিতলেন থানেত লিখতিকামপর্নের বিরুদ্ধে।

● **বক্সিংয়ে পাঁচ সোনা ভারতের :**

চেক প্রজাতন্ত্রে বক্সিং টুর্নামেন্টে দুরন্ত ফল ভারতের। পাঁচটি সোনা, দু'টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন ভারতীয় বক্সাররা। যা হামবুর্গে আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাড়তি উৎসাহ দেবে ভারতীয় বক্সারদের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী শিব থাপা (৬০ কেজি), প্রাক্তন কমনওয়েলথ সোনাজয়ী মনোজ কুমার (৬৯ কেজি), অমিত ফাঙ্গাল (৫২ কেজি), গৌরব বিধুরি (৫৬ কেজি) এবং সতীশ কুমার (+ ৯১ কেজি) সোনা জিতেছেন। রুপো পান কাবিন্দর বিস্ত (৫২ কেজি) এবং মণীশ পানওয়ার (৮১ কেজি)। এর আগে সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায় সুমিত সাঙ্গওয়ানকে (৯১ কেজি) ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অমিত এবং কাভিন্দরের লড়াই দিয়ে শুরু হয় ভারতের সোনা জয়। ফাইনালে অমিতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার সতীর্থ কাভিন্দর। অমিত এই প্রতিযোগিতায় ফ্লাইওয়েট বিভাগে নেমে ৩-২ হারান কাভিন্দরকে। এর পরে গৌরব নামেন পোল্যান্ডের ইয়ানাও জরোস্ল-র বিরুদ্ধে। সহজেই জেতেন ৫-০। সম্প্রতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী শিব থাপাও ৫-০ উড়িয়ে দেন স্লোভাকিয়ার ফিলিপ মেসজারোসকে। ৫-০ জেতেন মনোজ কুমারও। তিনি হারান স্থানীয় তারকা ডেভিড কর্ককে। তবে সতীশ কুমারের জার্মানির ম্যাক্স কেলারের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হয়নি। হাড্ডাহাড্ডি লড়ে তবে জেতেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ২৫ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্টে নানা ভারতীয় বক্সারদের মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবেন অমিত, কাভিন্দর, গৌরব, শিব, মনোজ, সুমিত এবং সতীশ। এছাড়া এই দলে আছেন বিকাশ কৃষাণও (৭৫ কেজি)।

● **প্রো-কবাডি লিগ শুরু :**

ঢাকে কাঠি পড়ল ২০১৭ প্রো-কবাডি লিগের। চার পেরিয়ে পাঁচে পা দিল মেগা এই কবাডি টুর্নামেন্ট। গত চার বছর ধরে আইপিএল-আইএসএল-এর ভিড়েও, স্বমহিমায় প্রো-কবাডি লিগ। যার ফল, আট দলের পরিবর্তে প্রো-কবাডি লিগের পঞ্চম সংস্করণটি হচ্ছে ১২-টি দল নিয়ে। ৩ মাস ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলবে এই টুর্নামেন্ট। গত ২৮ জুলাই হায়দরাবাদে উদ্বোধন হয় লিগের। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু—এই রাজ্যগুলি থেকে নতুন চারটি দল অংশ নেবে এবারের প্রো-কবাডি লিগে। গাচিবলি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় তেলুগু টাইটান্স এবং তামিল থালাইভাস। ২৮ অক্টোবর চেন্নাইতে ফাইনাল হওয়ার কথা এই টুর্নামেন্টের। প্রো-কবাডি লিগে অংশগ্রহণকারী ১২-টি দল : বেঙ্গল ওয়ারিয়র্স, বেঙ্গালুরু বুলস, দাবাং দিল্লি কেসি, গুজরাট ফরচুনজায়ান্টস, হরিয়ানা স্টিলার্স, জয়পুর পিঙ্ক প্যান্থার্স, পুণেরী পল্টন, ইউ মুম্বা, পটনা পাইরেটস, তামিল থ্যালাইভাস, তেলেগু টাইটান্স এবং ইউপি যোদ্ধা।

● **এক দিনে সাঁতারে অ্যাডাম পিটির জোড়া বিশ্বরেকর্ড :**

ব্রিটিশ সাঁতারু অ্যাডাম পিটি বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একই দিনে জোড়া বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক ইভেন্টে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ২২ বয়র বয়সি অ্যাডাম প্রথমে হিটে ২৬.১০ সেকেন্ড সময় করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। পরে সেমিফাইনালে নিজেরই গড়া নজির ভেঙে দেন ২৫.৯৫ সেকেন্ডে শেষ করে। অন্যদিকে, মেয়েদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকেও গত ২৫ জুলাই বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জিতলেন কানাডার কাইলি মাসে। ২১ বছর বয়সি কাইলি ৫৮.১০ সেকেন্ড সময় নেন। ভেঙে দেন ২০০৯ সালে জেমা স্পথফোর্থের ৫৮.১২ সেকেন্ডের রেকর্ড।

● **২০২১-এর বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে :**

গত ২৪ জুলাই দু' দিনব্যাপী এগ্‌জিকিউটিভ কমিটির বৈঠক শেষে ভারতকে ২০২১ সালে পুরুষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক দেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এআইবিএ-র প্রেসিডেন্ট চিং কুউ উ। এই প্রথম বক্সিং-এর অন্যতম মেগা এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে চলেছে ভারত। শুধু পুরুষদের বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, আগামী বছর মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসরও বসতে চলেছে ভারতে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই টুর্নামেন্টের

আয়োজন করছে বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। এর আগে ২০০৬ সালে প্রথম মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক দেশের দায়িত্ব পালন করেছিল ভারত।

● **শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতের নজিরবিহীন জয় :**

তৃতীয় দিনের চা-পানের বিরতির মধ্যেই শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করার মিশন সম্পূর্ণ করে ফেললেন তারা। ইনিংস ও ১৭১ রানে ম্যাচ জিতে বিরল কীর্তি স্থাপন করে ফেলল বিরাট কোহালির টিম। এর আগে কোনও তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বিদেশি কোনও দল হোয়াইটওয়াশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে এগারো বছর আগে। ২০০৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের দেশে ৩-০-এ হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তারপর এই প্রথম কোহালির ভারত বিদেশি দল হিসেবে হোম টিমকে তিন বা বেশি ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করল। এশিয়ার কোনও দলও বিদেশের মাঠে গিয়ে এই কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। শিখর ধবন সিরিজের সেরা হন। প্রসঙ্গত, প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়ে যায় চার দিনেই। জোড়া সেঞ্চুরি করেও ইনিংসে হার ঠেকাতে পারল না হোম টিম। এক ইনিংস আর ৫৩ রানে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতে নিল ভারত।

➲ **দ্রুততম ১৫০ টেস্ট উইকেট নিয়ে জাডেজার নজির :**

শ্রীলঙ্কার মাটিতে রেকর্ড গড়লেন বাঁ হাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা। মাত্র ৩২-টি টেস্ট খেলে ১৫০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন সৌরাষ্ট্রের এই ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে দ্রুততম ১৫০ টেস্ট উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করলেন জাডেজা। প্রথম স্থানে আছেন জাডেজার অন্যতম সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মাত্র ২৯-টি টেস্ট খেলে ১৫০ উইকেট নিয়েছিলেন অশ্বিন। গত ৫ আগস্ট কলম্বো টেস্টে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস চলাকালীন ১৫০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েন আইসিসি তালিকার শীর্ষে থাকা রবীন্দ্র জাডেজা। তার ১৫০তম শিকার ছিলেন শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় ডি'সিলভা। অন্য দিকে, সম সংখ্যক উইকেট নিতে কিংবদন্তি স্পিনার এরাপল্লি প্রসন্ন এবং অনিল কুম্বলের লেগেছিল ৩৪-টি টেস্ট। হরভজন সিং এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ৩৫-টি টেস্ট খেলে। তবে, বাঁ হাতি স্পিনারদের মধ্যে জাডেজাই দ্রুততম ১৫০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন। জাডেজার পরে আছেন বিনু মাঁকড় (৪০ টেস্ট), বিষেণ সিং বেদী (৪১ টেস্ট), রবি শাস্ত্রী (৭৮ টেস্ট)।

➲ **ধোনির রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট :**

অধিনায়ক হিসাবে বিদেশের মাটিতে সব থেকে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তার পরই এতদিন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ের শিরোপা ছিল এমএস ধোনির মাথাতেই। এবার তা চলে গেল বিরাট কোহলির কাছে। ধোনি ছ'টি টেস্ট জিতেছিলেন। গত ১৪ আগস্ট শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সাতটি টেস্ট জিতে তাকে ছাপিয়ে গেলেন কোহালি। সৌরভের দখলে রয়েছে ১১-টি টেস্ট জয়। ধোনি টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ৬০-টি ম্যাচে। সৌরভ সেখানে মাত্র ৪৯-টি টেস্টে। কোহালি এখানে পৌঁছেছেন মাত্র ২৯ টেস্ট খেলে।

● **আইসিসি বিশ্বকাপ দলের ক্যাপ্টেন মিতালি :**

আইসিসি বিশ্বকাপ দলের ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়া হল ভারতের মিতালি রাজকে। বিশ্বকাপ শেষে এটাই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সব থেকে বড়ো প্রাপ্তি। আইসিসি-র বিচারে বিশ্ব একাদশের মাথায় এখন এক ভারতীয়। তিনি ছাড়াও এই দলে জায়গা করে নিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর ও দীপ্তি শর্মা। গত ২৩ জুলাই শেষ হয়েছে বিশ্বকাপ। এর পরের দিনই এই দল ঘোষণা করে আইসিসি। দীর্ঘদিন ধরেই সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় দল পরিচালনা করছেন মিতালি। বিশ্বকাপেও একই ভূমিকায় পাওয়া গিয়েছে তাকে। ইংল্যান্ডের কাছে হারলেও পুরো টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতেও দারুণ সাফল্য এসেছে মিতালির। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান (৪০৯) তারই। মিতালির ব্যাট সব থেকে বেশি চমক দেখিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে। তার ১০৯ রানের ইনিংস ভারতকে জয়ের রাস্তা দেখিয়েছিল। এছাড়া এই তালিকায় চারজন প্লেয়ার রয়েছে ইংল্যান্ড থেকে, তিন জন দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অস্ট্রেলিয়া থেকে। ১২ নম্বর প্লেয়ারও ইংল্যান্ডের।

● **কাশ্যপকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন গ্রাঁ প্রি জিতলেন প্রণয় :**

গত ২৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ওপেন গ্রাঁ প্রি-এর ফাইনালে পারুপল্লি কাশ্যপকে ২-১ সেটের ব্যবধানে উড়িয়ে দিলেন প্রণয়। এইচ. এস. প্রণয়ের পক্ষে খেলার ফল ছিল ২১-১৫, ২০-২২, ২১-১২। এদিন কেরিয়ারের তৃতীয় গোল্ড গ্রাঁ প্রি খেতাব জয়ের জন্য ম্যাচের প্রথম থেকেই ফোকাসড ছিলেন প্রণয়। পারুপল্লিকে কার্যত দাঁড় করিয়ে ২১-১৫ ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন তিনি। ২০-২২ ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান কাশ্যপ। তৃতীয় এবং ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণকারী সেটে ২১-১২ ব্যবধানে দেশীয় সতীর্থকে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য গ্লোল্ড গ্রাঁ প্রি খেতাব জিতে নেন ২৫ বছর বয়সী এই শার্টলার।

● **আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিং :**

➲ **র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের মহিলা ক্রিকেটার দল :** হরমনপ্রীত কৌর বিশ্বকাপ শেষে আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩ থেকে এক লাফে পৌঁছে গেলেন ছ'য়ে। তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ঢুকে পড়লেন সেরা দশে। দু' নম্বর মিতালি রাজ। ভারতের পুণম রাউত ১৪ নম্বরে। তিনি উঠেছেন চার ধাপ। শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মেগ ল্যালিং। ভারতের ভেদা কৃষ্ণমূর্তি সাত ধাপ উঠে জায়গা করে নিয়েছেন ২৬ নম্বরে। বোলিংয়ে ভারতের হয়ে শীর্ষে ঝুলন গোস্বামী। যদিও র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। চার ধাপ উঠেছেন ঝুলন। শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজেন ক্যাপ। ঝুলনের বোলিং পার্টনার শিখা পাণ্ড্য এক ধাপ উঠে ১২ নম্বরে। লেগ স্পিনার পুণম ছ' ধাপ উঠে ২৮ নম্বরে। বোলিং-এ সেরা দশে রয়েছেন ভারতের একমাত্র ঝুলই। টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের জায়গা হয়েছে চার নম্বরে। শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইংল্যান্ড। তিনে নিউজিল্যান্ড। পাঁচে দক্ষিণ আফ্রিকা।

➲ **পুরুষদের ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিং**

গত ১৮ আগস্ট প্রকাশিত ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানের তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। ৮৭৩

পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকলেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড মিলারের থেকে। তৃতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডে ভিলিয়ার্স। চারে ইংল্যান্ডের জো রুট ও পাঁচে পাকিস্তানের বাবর আজম। প্রথম দশে নেই আর কোনও ভারতীয়। এর পর ১২, ১৩, ১৪ নম্বরে পর পর রয়েছেন এমএস ধোনি, শিখর ধবন ও রোহিত শর্মা। বোলিং-এ শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার জোস হ্যাজেলউড। প্রথম দশে নেই কোনও ভারতীয় বোলার। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির। তিনে অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। চার ও পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা ও নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। ভারতের ভুবনেশ্বর কুমার রয়েছেন ১৩ নম্বরে। টেস্টের মতো ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়েরও শীর্ষে রয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের মহম্মদ হাফিজ ও তিনে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। চার ও পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার জেমস ফকনার ও শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস।

➲ অলরাউন্ডারদের তালিকা

রবীন্দ্র জাডেজাকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। জাডেজা নেমে গেলেন দ্বিতীয় স্থানে। ভারত-শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় টেস্টের পর আইসিসি-র প্রকাশিত অলরাউন্ডারদের তালিকায় নিজের এক নম্বর স্থান হারিয়েছিলেন সাকিব। ৪৩৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সেরা তকমা পেয়েছিলেন ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে আইসিসি-র 'কোড অব কন্ডাক্ট' ভাঙার কারণে ৪৩০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসেন তিনি। অন্য দিকে, ৪৩১ পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি তালিকায় প্রথম স্থান ফিরে পান সাকিব। শুধু টেস্ট ক্রিকেটেই নয়, তিন ফরম্যাটেই শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। সাকিব এবং জাডেজার পর আইসিসি-র অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মইন আলি ও বেন স্টোকস। আইসিসি-র বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে সাকিবের স্থান ১৭।

➲ টেস্ট র‍্যাঙ্কিং

টেস্ট ব্যাটিংয়ের সেরা দশে ঢুকে পড়লেন লোকেশ রাহুল। যে তালিকায় রয়েছেন ভারতের চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহালি ও অজিঙ্ক রাহানে। তালিকায় দু' ধাপ এগিয়ে ন'-য়ে উঠে এলেন ভারতের এই ওপেনার। শিখর ধবনও ১০ ধাপ উঠে জায়গা করে নিয়েছেন ২৮ নম্বরে। অলরাউন্ডার হার্দিক প্যাণ্ড্য ৪৫ ধাপ উঠে জায়গা করে নিয়েছেন ৬৮ নম্বরে।

টেস্ট ব্যাটিং তালিকায় এই মুহূর্তে শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের জো রুট ও নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। চারে ভারতের চেতেশ্বর পূজারা। পাঁচে বিরাট কোহালি। নয় ও দশে রয়েছেন লোকেশ রাহুল ও অজিঙ্ক রাহানে। বোলিংয়ে অবশ্য শীর্ষেই রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। ৮৮৪ রেটিং নিয়ে তিনিই বর্তমানে আইসিসি-এর সেরা টেস্ট বোলার। দু'-য়ে ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন ও তিনে রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **কানাডায় মাতৃগর্ভেই হার্ট সার্জারি :**

কানাডার বাসিন্দা ক্রিস্টোফার হ্যাভিল এবং ক্রিস্টিন বেরির প্রথম সন্তান সেবাস্টিয়ান। যে জটিল রোগে আক্রান্ত ছিল সে, ডাক্তারি পরিভাষায় তার নাম ট্রান্সপোজিসন অব গ্রেট আর্টারি (টিজিএ)। এই রোগে হৃদযন্ত্র থেকে রক্ত সঞ্চালন একরকম বন্ধই হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা নিশ্চিত ছিলেন, জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করলে শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। মেডিক্যাল টিম গঠন করে মাতৃগর্ভেই অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জটিল এই অস্ত্রোপচারের নাম আট্রিয়াল সেপ্টোপ্লাস্টি। মা-র গর্ভে একটি সূঁচ ঢুকিয়ে আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে শিশুর হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন চিকিৎসকেরা। সূঁচের শেষ প্রান্তে লাগানো থাকে একটি ছোটো বেলুন। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই হল হার্টের অস্ত্রোপচার। সুস্থ জীবন নিয়ে পৃথিবীর আলোল দেখল সেবাস্টিয়ান। মাতৃগর্ভে এভাবে অস্ত্রোপচারের নজির বিশ্বে প্রথম।

● **'ব্লু হোয়েল গেম' :**

'ব্লু হোয়েল গেম'। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি চাইতে হয়। ওয়েবসাইট থেকে আবেদনকারীর বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া হয়। তার পরে হুমকির সুরে জানানো হয়, পঞ্চাশ দিনের ওই খেলায় সব কাজ ঠিকমতো না করলে আবেদনকারীর পরিবারের ক্ষতি করে দেওয়া হবে, কারণ তাদের হাতে সব তথ্য রয়েছে। একের পর এক নির্দেশ মানতে মানতে শেষ ধাপে আত্মহত্যার নির্দেশও পালম করে ফেলে খেলোয়াড়। এমন আরও বহু বিপদ লুকিয়ে আছে ইন্টারনেটের একাধিক সাইটে, বিভিন্ন নামে। বছরখানেক আগেও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আরও এক সাইবার ক্রীড়া, যার জেরে আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল পথ দুর্ঘটনা। কিন্তু সমস্ত সাবধান বার্তা উপেক্ষা করেই খেলার নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন অনেকে। খেলা আছে আরও, যা বিপদ ডেকে আনে ধীরে।

● **প্রথম ডাউন সিনড্রোম মুক্ত দেশ হওয়ার পথে আইসল্যান্ড :**

ডাউন সিনড্রোম একটি জিনগত ত্রুটি। এক্ষেত্রে ২১ নম্বর ক্রোমোজোমটিতে একটি অতিরিক্ত 'কপি' থাকে। এই অবস্থাকে ট্রাইজোমি বলা হয়। এই জিনগত ত্রুটির কারণে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদের আইকিউ লেভেল সাধারণ শিশুদের তুলনায় কম থাকে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই ডাউন সিনড্রোমের মতো গুরুতর জেনেটিক ডিসঅর্ডার নিয়ে আর কোনও শিশুর জন্ম হবে না আইসল্যান্ডে। বিশেষজ্ঞদের আশা, খুব দ্রুত সেই পথেই এগোচ্ছে আইসল্যান্ড। সমীক্ষা বলছে, সারা বছরে আইসল্যান্ডে যত শিশুর জন্ম হয়, তার মধ্যে মাত্র এক অথবা দু'টি শিশু ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত। এর প্রধান কারণ অবশ্যই প্রি-নেটাল চেকআপ নিয়ে হবু বাবা-মায়েদের সচেতনতা। ২০০০ সালের প্রথম দিকে প্রি-নেটাল টেস্টের ধারণা আসে। ডাউন সিনড্রোম এমন একটি জেনেটিক সমস্যা যা প্রি-নেটাল টেস্টগুলির মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব। আইসল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, ১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করানো বৈধ। যদি পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভস্থ ভ্রূণের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে গর্ভপাত

করানো সে দেশে অতি পরিচিত ঘটনা। আর নাগরিকদের এই 'অভ্যাসেই' সাফল্যের মুখ দেখতে চলেছে আইসল্যান্ড। সম্পূর্ণভাবে ডাউন সিনড্রোম মুক্ত দেশের তকমা লাভ করার দিকে এগিয়ে চলেছে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার নাগরিকের হিমশীতল এই ভূখণ্ড। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ১৯৯৫-২০১১ সালের মধ্যে আমেরিকায় ৬৭ শতাংশ ডাউন সিনড্রোম কমেছে, ফ্রান্সে কমেছে ৭৭ শতাংশ, ডেনমার্কে প্রায় ৯৮ শতাংশ।

● **মুগা থেকে নকল কার্টিলেজ তৈরি :**

আর শুধুই শাড়ি তৈরির কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে না অসমের মুগা। এবার বাতের ব্যথা নিরাময়, গাঁটের বেদনা সারাতেও বড়ো ভরসা হতে চলেছে রেশম। সিল্ক প্রোটিন আর বায়োঅ্যাকটিভ গ্লাস ফাইবারের মিশ্রণে নকল কার্টিলেজের স্তর তৈরি করে ফেলেছেন আইআইটি গুয়াহাটিতে বায়োসায়েন্স ও বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক বিমান মণ্ডল। তার দাবি, এর সাহায্যে হাড়ের কোষের পুনর্গঠন ও ছিঁড়ে যাওয়া টিস্যু সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। গেঁটে বাত এখন কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ৪০ বছরের আগেই অনেকের ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। জয়েন্টগুলির কার্টিলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে বিনা চিকিৎসাতেই পড়ে থাকে। তাই ব্যথাও স্থায়ী হয়ে যায়। টিস্যুর বিকল্প না থাকায় চিকিৎসাও সীমাবদ্ধ। অস্টিও-আর্থ্রাইটিস ভারতের সবচেয়ে বেশি হওয়া হাড়ের রোগ। ইংল্যান্ডে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের পরীক্ষাগারে স্বাভাবিক কার্টিলেজের বিকল্প তৈরির চেষ্টা করেছে। সংশ্লিষ্ট গবেষক জানান, সময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক টিস্যু ওই রেশম তন্তুর স্থান নিয়ে নেবে। কিন্তু পুরো পরীক্ষাটি গবেষণাগারে সফল হলেও আসল মানব শরীরে তা পরীক্ষা করা বাকি। পরীক্ষা সফল হলে বাতের স্থায়ী চিকিৎসার খরচ অনেক কমে আসবে।

প্রয়াণ

● **যশপাল :**

গত ২৪ জুলাই উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় নিজের বাড়িতে মারা গেলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী যশপাল। বয়স হয়েছিল ৯০। গত কয়েক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী তিনি। ১৯২৬ সালের ২৬ নভেম্বর বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের জঙ্গ জেলায় জন্ম। দেশভাগের পর এ দেশে চলে আসে তার পরিবার। স্নাতক হওয়ার পরে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে (টিআইএফআর) কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ। দেশে ফিরে টিআইএফআর-এ ফের কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালে ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস-এর সূচনা করে ভারত সরকার। সেই সময় আমেদাবাদে স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। কসমিক রে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-সহ বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তার অবদান রয়েছে। ১৯৭৬ সালে তাকে পদ্মভূষণ এবং ২০১৩-এ পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে ভারত সরকার।

● **সন্তোষমোহন দেব :**

গত ২ আগস্ট চলে গেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব। শিলচরের একটি হাসপাতালে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চলছিল তার। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ১৯৮০ সালে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে মোট সাতবার সাংসদ হয়েছেন সন্তোষমোহন। এর মধ্যে পাঁচবার অসমের শিলচর থেকে এবং দু'বার ত্রিপুরা থেকে। ১৯৮৬-'৮৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৮ সালে এক বছরের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কুর্সিতেও বসেছিলেন। ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাওয়ের আমলে ইস্পাতমন্ত্রী ছিলেন। মনমোহন সিং-এর ইউপিএ-১ সরকারের সময় ভারী শিল্প দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন সন্তোষমোহন।

● **জ্ঞানসিং সোহনপাল :**

টানা দশবারের বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গের রেলশহর, খড়্গপুরের 'চাচা' জ্ঞানসিং সোহনপাল (৯৩) প্রয়াত হলেন। গত ৮ আগস্ট কলকাতার এসএসকেএম-এ মৃত্যু হয় তার। চিকিৎসক জানান, সেপসিস, রেনাল ফেলিওর এবং মাল্টি অরগ্যান ফেলিওরেই মৃত্যু হয়েছে। ১৯২৫ সালের ১১ জানুয়ারি খড়্গপুরেই জন্ম জ্ঞানসিং-এর। আদতে লুধিয়ানার বাসিন্দা জ্ঞানসিং-এর বাবা বিষেণসিং সোহনপাল কর্মসূত্রে এই শহরে এসেছিলেন। কলেজ জীবন পেরিয়ে কিছু দিন সাংবাদিকতা করেছিলেন। তার পর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯৬২-তে প্রথম বিধানসভায় গিয়েছিলেন জ্ঞানসিং। অজয় মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভায় কারা, পরিবহণের মতো দপ্তর সামলেছেন। ১৯৮২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা খড়্গপুর সদরের বিধায়ক ছিলেন। বহুবার প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্বও সামলেছেন।

● **ক্রিস্টাল :**

১১৩ বছর বয়সে মারা গেলেন বিশ্বের বয়স্কতম ব্যক্তি ইসরায়েলের ক্রিস্টাল। গত ১২ আগস্ট তার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয় সে দেশের সংবাদমাধ্যমে। ২০১৬-তে বিশ্বের বয়স্কতম পুরুষ হিসাবে গিনেজ বুক-এ নাম তুলেছিলেন ক্রিস্টাল। জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ইজরায়েলের নাগরিক হলেও তার জন্ম পোল্যান্ডে। নাতি-নাতনি, পৌত্রী-প্রপৌত্রীতে ভরা সংসার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রিস্টাল পোল্যান্ডের লোজে চলে আসেন। হাত লাগান পারিবারিক ব্যবসায়। জীবনে দুঃসময় নেমে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। নাজিদের দখলে চলে যায় পোল্যান্ড। ক্রিস্টালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নাজিদের কুখ্যাত ক্যাম্প অসউইজ-বিরকেনাওতে। এই সময়ের মধ্যেই তার সন্তান ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যুদ্ধ শেষে যখন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পান, তখন ওজন কমে ৩৭ কেজি। বাঁচার রসদ খুঁজতে পাড়ি দেন ইজরায়েলে। সেখানে গিয়ে একটি মিষ্টির দোকন খোলেন। ফের বিয়ে করেন। তার এ পক্ষের স্ত্রীর দুই সন্তান। সেই সংসার আস্তে আস্তে বাড়ে। ৯ নাতি-নাতনি এবং ৩২ জন পৌত্রী ও প্রপৌত্রীর মাঝে দিন কাটাচ্ছিলেন। জন্মদিনের এক মাস আগেই মারা গেলেন বিশ্বের এই বয়স্কতম ব্যক্তি।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

আমাদের প্রকাশন

রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ভাষণের চতুর্থ খণ্ডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

দেশের সদ্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর গত ২৪ জুলাই, ২০১৭-য় তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী "Selected Speeches of President Pranab Mukherjee" বইটির চতুর্থ খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। বইটির প্রথম দু'টি কপি প্রধানমন্ত্রী সদ্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী মুখোপাধ্যায় ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের হাতে তুলে দেন।

প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার কার্যকালের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন সেগুলি সংকলিত করা হয়েছে চার-খণ্ডে প্রকাশিত এই সিরিজের শেষ খণ্ডে। সিরিজের আগের তিনটি খণ্ডে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার কার্যকালের প্রথম তিন বছরে প্রদত্ত নির্বাচিত ভাষণগুলি সংকলিত করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত ভাষণগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) জাতি, সংসদ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং সশস্ত্র বাহিনী; (২) গুরুত্বপূর্ণ দিন ও ঘটনা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উদ্‌যাপিত ঘটনাসমূহ; (৩) ব্যাংকোয়েটে প্রদত্ত ভাষণ ও বিদেশ সফর; (৪) পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান; (৫) শিক্ষা ও সম্মেলন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ভাষণগুলি সংকলিত করে চারটি খণ্ডের এই সিরিজ প্রকাশ করেছে প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার।

ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসস্থান রাইসিনা হিলস্ এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরম্পরার গুরুত্ব অমূল্য। রাষ্ট্রপতির বাসভবনের এই দিকগুলিকে নিয়ে গত তিন বছর ধরে রাষ্ট্রপতির দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশন বিভাগ 'রাষ্ট্রপতি ভবন' শীর্ষক আরেকটি গ্রন্থমালাও ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থমালায় ঠাঁই পেয়েছে মোট ১৩-টি বই। এই বইগুলি প্রকাশন বিভাগের সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রে ও অনলাইনে bharatkoshportal.gov.in-এ পাওয়া যাচ্ছে।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবারও সাফল্যে No.1

1st EXE WBCS - 2015

Souvik Ghosh

1st CTO WBCS - 2015

Moumita Sengupta

1st CTO WBCS - 2014

Suraiya Gaffar

2nd CTO WBCS - 2014

Md Shabbar Khan

2nd DSP WBCS - 2014

Saquib Ahmed

4th EXE WBCS - 2016

Shantanu Singha Thakur

5th EXE WBCS - 2016

Debjit Dutta

6th EXE WBCS - 2016

Tuhin Subhra Mahanty

3rd SCFS WBCS - 2016

Dipanjan Jana

4th CTO WBCS - 2014

Amartya Debnath

4th EXE WBCS - 2014

Abhishek Basu

4th DSP WBCS - 2014

Rohed Shaikh

WBCS Gr. A-এর মোট সাফল্যের মধ্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার

YEAR	PSC-এর মোট সিলেকশন	অ্যাকাডেমিকের ছাত্রছাত্রী	সাফল্যের শতকরা হার
WBCS-2016	67	21	31.5%
WBCS-2015	113	30	27%
WBCS-2014	182	43	24%
WBCS-2013	149	35	23%

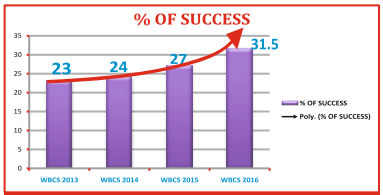

SUCCESS RATE OF ACADEMIC ASSOCIATION

WBCS-2016 Gr. A এর ফাইনাল রেজাল্ট প্রকাশিত হল ২৭শে জুলাই ২০১৭। PSC এর চূড়ান্ত তালিকায় মোট সফল ৬৭ জন

২১ জন চূড়ান্ত সফল হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে

EXE — KRISHANU ROY

EXE — MOUMITA GHOSH

EXE — JAYANTA DEBABRATA CHOUDHURY

EXE — SK.WASIM REJA

EXE — MASUD KARIM SK

EXE — RASHMIDIPTA BISWAS

CTO — DEBASHIS PAUL

CTO — MD WARSHID KHAN

CTO — SARWAR ALI

EXCISE — SUMAN MAITY

EXCISE — RAJBHUBAN NARAYAN BISWAS

FOOD & SUPPLY — SANGITA BANERJEE

FOOD & SUPPLY — SHYAMAL HALDER

ADSR — ARIJIT DWARI

ADSR — PIJUSH KHAN

ADSR — MONOJIT BARAI

POSTAL COURSE ALSO AVAILABLE

আপনি কি গ্র্যাজুয়েট ?

WBCS 2018 নতুন ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। ক্লাস নেবেন WBCS অফিসাররা।

MOCK TEST FOR PRELIM-2018

- ১৫টি মকটেস্ট
- ৫০টি ক্লাসটেস্ট
- কোয়েশ্চন ব্যাঙ্ক
- সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্

মকটেস্ট শুরু ২৭ শে আগষ্ট, ২০১৭ থেকে

Contact : 8599955633 / 9038786000

DATE OF VSTS	VST
27.08.17	VST - 1
10.09.17	VST - 2
24.09.17	VST - 3
08.10.17	VST - 4
22.10.17	VST - 5
05.11.17	VST - 6
12.11.17	VST - 7
19.11.17	VST - 8
26.11.17	VST - 9
03.12.17	VST - 10
10.12.17	VST - 11
17.12.17	VST - 12
24.12.17	VST - 13
31.12.17	VST - 14
07.01.18	VST - 15

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

September, 2017
R.N.I. No. 19740/69

Publications on Mahatma Gandhi

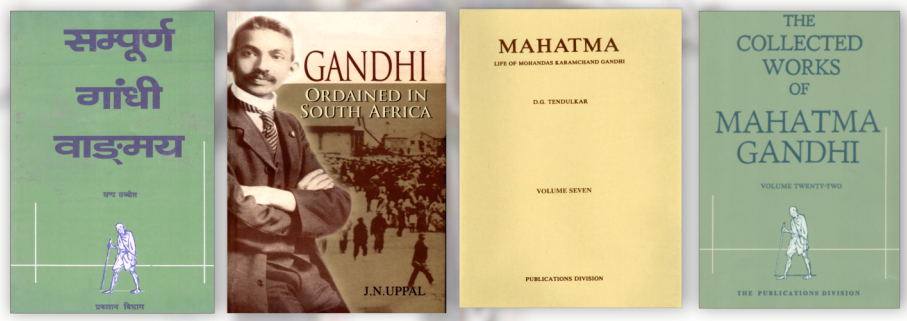

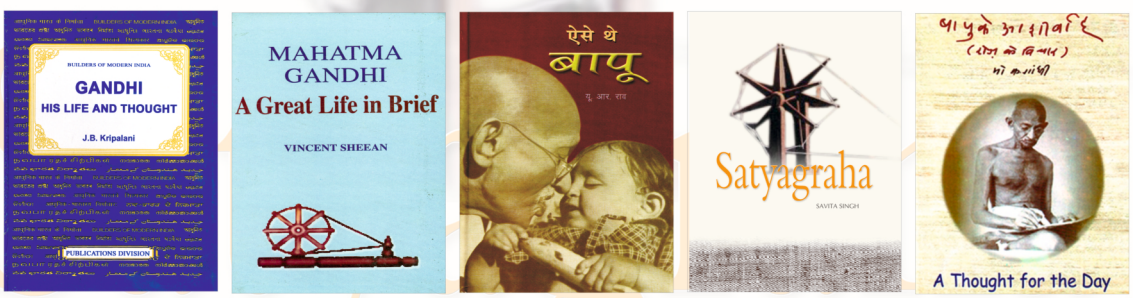

Remembering the Martyrs

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।